POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ؕ

এবং তুমি আমাদের জন্য এই দুনিয়াতে কল্যাণ নির্ধারিত কর এবং পরকালেও। নিশ্চয় আমরা তোমার দিকে অনুতাপের সহিত ফিরিয়াছি।

(আল আরাফ: ১৫৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 43-44

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 27 অক্টোবর-3 নভেম্বর, 2022 30 রবিউল আওয়াল-৭ রবিউস সানি 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কেউ যদি কারো আঙুল কামড়ে ধরে আর যার আঙুল কামড়ানো হচ্ছে সে আঙুল টেনে নেওয়ার কারণে দাঁত ভেঙ্গে যায় তবে দাঁতের ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে না।

২২৬৫) হযরত ইয়ালা বিন উমাইয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন- আমি জায়েশুল উসরা, অর্থাৎ তবুকের যুদ্ধে নবী (সা.)-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমার মতে এই কাজটি আমার সেই কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত যা (পুণ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে) সব থেকে বেশি নির্ভরযোগ্য হতে পারত। (আমার সঙ্গে) আমার এক দিনমজুরও ছিল যে এক ব্যক্তির সঙ্গে হাতাহাতিতে লিপ্ত হয়। হাতাহাতি করতে গিয়ে তাদের মধ্যে একজন অপর জনের আঙুল কামড়ে ধরে, সে আঙুল সজোরে টান মারলে তার দাঁত ভেঙ্গে পড়ে। তখন সে নবী (সা.)-এর কাছে অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হয়। আঁ হযরত (সা.) তাকে তার দাঁতের কোনও ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দেন নি। তিনি (সা.) বলেন, সে কি নিজের আঙুল তোমার মুখের মধ্যে রেখে দিত যাতে তুমি তা চিবাতে পার? (ইবনে হারীজ) বলেন: আমার মনে পড়ছে, আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন, 'যেভাবে ষাঁড় চেবায়।

(বুখারী, কিতাবুল ইজারাহ)

আমার অভিপ্রায় এবং যে উদ্দেশ্যে খোদা তা'লা আমাকে আবির্ভূত করেছেন তা ততক্ষণ পূর্ণ হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ এখানে বার বার আসে এবং বার বার আসার কারণে ক্লান্ত না হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

১৮৯৯ সালের ডিসম্বর মাসে খুব কম লোকই বার্ষিক জলসায় যোগ দিতে আসেন। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "বর্তমানে মানুষ আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ এবং আমি তাদের কি হতে দেখতে চাই সে সম্পর্কে তারা অনবহিত। আমার অভিপ্রায় এবং যে উদ্দেশ্যে খোদা তা'লা আমাকে আবির্ভূত করেছেন তা ততক্ষণ পূর্ণ হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ এখানে বার বার আসে এবং বার বার আসার কারণে ক্লান্ত না হয়। "

তিনি আরও বলেন: " যে ব্যক্তির এখানে আগমণকে নিজের জন্য বোঝাস্বরূপ মনে করে কিম্বা তার মনে এমন চিন্তার উদ্রেক হয় যে এখানে থাকলে আমার উপর বাড়বে, তার ভীত হওয়া উচিত, কেননা সে শিরক করে। আমার বিশ্বাস, যদি সারা জগতবাসীও আমার পরিবার হয়ে যায় তবে আমার এই কাজের বিষয়টি খোদা তা'লা দেখবেন। আমার উপর কোনও বোঝা নেই। আমার সঙ্গীদের উপস্থিতিই আমাকে অপরিমেয় আনন্দ দেয়। এটি এক প্রকার কুমন্ত্রণা যা হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেলা বাঞ্ছনীয়। আমি কাউ কাউকে বলতে শুনেছি যে, আমরা এখানে বসে থেকে হযরত সাহেবকে কেন কষ্ট দিব? আমরা তো এমনিতে অকর্মা। কেন অযথা বসে বসে অন্ন ধ্বংস করব? তাদের একথা স্মরণ রাখুক! এটি শয়তানী কুমন্ত্রণা যা শয়তান তাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেছে যাতে তারা এখান থেকে দূরে সরে যায়।

একদিন হাকিম ফযল দ্বীন সাহেব নিবেদন করলেন:, হুযুর! আমি এখানে অযথা বসে কি করি? আদেশ পেলে ভেরা ফিরে যাই। সেখানে অন্তত কুরআনের দরস দিব। এখানে আমি চরম বিব্রত বোধ করছি, আমি হুযুরের কোনও কাজে আসি না আর অযথা বসে থাকলে পাছে কোনও পাপ হয়।" হুযুর (আ.) বলেন: আপনার এখানে বসে থাকাই জিহাদ আর নিষ্ক্রিয় বসে থাকাটাই বিরাট কাজ। "

বস্তুত, যারা জলসায় আসে নি তাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাতুর ভাষায় অনুযোগ করে বলেন, অজুহাত তারাই খাড়া করে যারা হুযুর নিকট অজুহাত খাড়া করেছিল اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ আর খোদা তা'লা তাদেরকে এই বলে মিথ্যা প্রমাণিত করেন اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا - (আল আহযাব, আয়াত: ১৪) আমার বন্ধুদের কে একথা বলেছে যে জীবন অনেক দীর্ঘ? মৃত্যু কখন নেমে আসবে তার কোনও ঠিকানা নেই। তাই যেটুকু সময় পাওয়া যায় সেটিকেও আশীর্বাদ মনে করুন।"

তিনি বলেন: "এই দিনগুলি আর ফিরে আসবে না, শুধু গল্পগুলিই থেকে যাবে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪১১)

হযরত ইব্রাহিম (আ.) অজস্র গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। এতসব গুণাবলীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি খোদার বান্দা-ই ছিলেন আর কখনও ব্যক্তিগত গুণাবলীকে নিজের প্রতি আরোপিত করে শিরক করার দোষে দুষ্ট হন নি।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহলের ১ নং আয়াত

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ؕ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

নিশ্চয় ইব্রাহিম ছি ল সদগুণের পরম আদর্শ, আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত ও নিষ্ঠাবান এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (সূরা নহল, আয়াত: ১২১)

এর ব্যাখ্যায় বলেন: এই আয়াতে ইব্রাহিম (আ.)কে উম্মত বলা হয়েছে। এর একটি অর্থ হল তিনি পুণ্যের শিক্ষাদানকারী এবং যাবতীয় প্রকারের কল্যাণের সমষ্টি ছিলেন। দ্বিতীয়ত আমার মতে এতে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে 'ইজতাবাহু' অর্থাৎ তাঁর মধ্যে সেই সব শক্তিসমূহ ছিল যার দ্বারা জাতিসমূহের উৎপত্তি হয়। তাই, এই শক্তিসমূহের কারণেই তাকে উম্মত বা জাতি বলা যেতে পারে। অর্থাৎ উম্মতকে যদি বৃক্ষ হিসেবে ধরা হয় তবে তিনি হলেন বীজ।

এই আয়াতে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর বহু গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম তিনি ছিলেন একজন পুণ্যের শিক্ষাদানকারী। বিশ্বকে পুণ্যের শিক্ষা দান করতেন। দ্বিতীয়, তিনি যাবতীয় পুণ্যের সমষ্টি ছিলেন। সর্বপ্রকারের উন্নত চারিত্রিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তৃতীয়, তিনি অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যার মধ্যে অসাধারণ শক্তিসমূহ নিহিত ছিল যা থেকে জাতিসমূহের উৎপত্তি সম্ভব ছিল। চতুর্থ, তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন। প্রার্থনাকারী ছিলেন। পঞ্চম, তিনি একনিষ্ঠ ছিলেন। ..... ষষ্ঠ, তিনি মুশরিক ছিলেন। অর্থাৎ একেশ্বরবাদের উপর পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরিপূর্ণ তৌহিদ বা একেশ্বরবাদের অর্থ নেওয়া হয়েছে 'কানিতান লিল্লাহি' এবং হানীফা' থেকে। এর পর যে বাক্য রাখা হয়েছে তা থেকে প্রতিভাত হয় যে এখানে সাধারন একেশ্বরবাদীর কথা বলা হয় নি। বস্তুত, সচরাচর মানুষের মধ্যে যখন গুণাবলী সৃষ্টি হয়, তখন সে নিজের উপর ভরসা করতে শুরু করে আর তার মধ্যে অহংকার, আত্মদর্শিতা, অবাধ্যতা এবং আত্ম প্রশংসা জন্ম নেয়। সে নিজেকে বড় বলে মনে করতে শুরু করে। এটাও এর ধরণের শিরক। আল্লাহ্ তা'লা ইব্রাহিম (আ.) সম্পর্কে لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ বলার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, এতসব গুণাবলীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি খোদার বান্দা-ই ছিলেন আর কখনও ব্যক্তিগত গুণাবলীকে নিজের প্রতি আরোপিত করে শিরক করার দোষে দুষ্ট হন নি।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৬৮)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর (২০১৩)

মহিলাদের উদ্দেশ্যে হুযুরের আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ।

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পারে পর হুযুর আনোয়ার বলেন: সূরা হাদীদের ২১ ও ২২ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেন।

তোমরা জানিয়া রাখ, এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, চাক-চিক্র, সৌন্দর্য, তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মশ্লাঘা, এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃধির প্রতিযোগিতা মাত্র। ইহার দৃষ্টান্ত বারিধারার ন্যায় যাহার (দ্বারা উৎপাদিত) শাক-সবজি কৃষকদিগকে চমকতকৃত করে, অতঃপর উহা পরিপক্ক হয় এবং তুমি উহাকে হলুদবর্ণ দেখিতে পাও, যাহা অবশেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। এবং পরকালে রহিয়াছে (দুনিয়াদার লোকদের জন্য) কঠিন আযাব এবং (সৎকর্মশীল লোকদের জন্য) আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ক্ষমা এবং সন্তুষ্টি। এবং এই পার্থিব জীবন (সাময়িক) ছলনাময়ী ভোগ্যবস্তু ব্যতিরেকে কিছু নহে।

(হে লোক সকল!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ক্ষমা এবং এমন জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও, যাহার মূল্য আকাশ ও পৃথিবীর মূল্যের সমতুল্য; ইহা ঐ সকল লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনে। ইহা আল্লাহ্‌র বিশেষ ফযল, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন এবং আল্লাহ্ মহা ফযলের অধিকারী।

(সূরা হাদীদ: ২১-২২)

হুযুর আনোয়ার বলেন: যে আয়াতগুলি আমি তিলাওয়াত করেছি সেগুলি এই অধিবেশনের সূচনাতেও পঠিত হয়েছে। এই আয়াতগুলিতে মোমেন এবং গায়ের-মোমেনের কতক বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বস্তুবাদিদের কতক বৈশিষ্টের কথা বলা হয়েছে। আমার তিলাওয়াত করা প্রথম আয়াতের প্রতিপাদ্য হল কেবল জগত অর্জনের জন্য সেই সব বিষয় অবলম্বন করা থেকে বিরত থেকে মানুষ খোদা তা'লার সন্তুষ্টি ও ক্ষমা লাভ করতে পারে। বা ভিন্নবাক্যে বলা যেতে পারে যে, এই বিষয়গুলিই একজন বস্তুবাদিকে খোদা তা'লা থেকে দূরে নিয়ে যায় আবার এগুলিই একজন মোমেনকে খোদা তা'লার নৈকট্য প্রদানও করে। আর মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই যুগে এই বিষয়গুলির গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। কেননা এই যুগেই জাগতিকতার আড়ম্বর চরমে পৌঁছেছে। আর এর পিছনে মানুষ এমনভাবে ধাবিত হচ্ছে যেন খোদা তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কেই তারা উদাসীন। এমনকি যারা মুসলমান নামে পরিচয় দেয় তারাও ধর্ম ছেড়ে জাগতিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের জন্মলাভের উদ্দেশ্যকেই ভুলে যাচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সূরা জুমাতেও হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর আগমণের কথা উল্লেখ আছে। এই সূরার শেষে মুসলমানদেরকে এই বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, তোমরা জাগতিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের কর্তব্য ভুলে যাচ্ছে, ইবাদত ত্যাগ করছ। অথচ এই ক্রীড়াকৌতুক এবং জাগতিকতার থেকে বেশি কল্যাণ এবং রিযিক আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে যা তোমরা অর্জন করতে পার। অতঃপর তিনি অন্যত্র এও বলেন যে তোমরা তাকওয়া বিসর্জন দিয়ে জাগতিকতার পিছনে ধাবিত হচ্ছ। তোমাদের বোধবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বস্তুবাদিদের মতিভ্রম হলে তারা তাকওয়া থেকে দূরে সরে যায় আর জগতের চাকচিক্যেই তাদের আগ্রহ বেশি থাকে, তারা জগতের মাঝেই নিজেদের কল্যাণ দেখতে পায়। অতএব, এমন লোকেরা কখনওই মোমেন হতে পারে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখন আমি এই আয়াতগুলির বিষয়ে সংক্ষেপে সেই সব বিষয়ের উল্লেখ করব যা আল্লাহ্ তা'লা বস্তুবাদির লক্ষণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন-শুনে রাখ এবং ভাল করে শোন। তোমরা পৃথিবীতে যে জীবন অতিবাহিত করছ তা যদি তোমাদেরকে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন থেকে উদাসীন রাখে তবে তা নিছক ক্রীড়া কৌতুক মাত্র। 'লাহাও' বলা হয় খেলাধূলাকে এবং হাসি-ঠাট্টা করাকেও বলা হয়। আর 'লা'আব'ও প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এটি বেশি গভীর অর্থ প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। কিছু খেলাধূলা উপকারী যদি তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা হয় আর আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলিয়ে না দেয়, সর্বক্ষণ যদি খেলাধূলার প্রতিই মনোযোগ না থাকে। কিন্তু এটা এমন খেলাধূলা যার কোনও উপকারিতা নেই। এটা একেবারে বাজে কাজ যা মানুষকে তার জীবনের উদ্দেশ্য থেকে দূরে ঠেলে দেয়, এতটাই যে, মানুষ তখন স্থায়ী ও নিরন্তরভাবে সেই পথে চালিত হয়ে জীবনের উদ্দেশ্যই ভুলে যায়। মানুষ তখন খোদার দিকে প্রত্যাবর্তনের সমস্ত নিজের হাতেই বন্ধ করে দেয়। আজ আপনারা দেখুন, জগতের পাপাচারপূর্ণ জীবন এই ক্রীড়াকৌতুকেরই পরিণাম। আর প্রত্যাবর্তনের সমস্ত পথও বন্ধ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা সেই পথ বন্ধ করেন নি, মানুষ নিজেই বন্ধ করেছে। যেমন- জুয়া। এর জন্যও নিত্যনতুন পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রতিটি স্থানে, প্রতিটি সার্ভিস স্টেশনে, মার্কেটে জুয়া খেলার মেশিন লাগানো দেখতে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, কিছু কিছু খেলা শিশুদেরকেও খেলার ছলে জুয়া শেখাচ্ছে। এছাড়াও অনেক খেলা রয়েছে যেগুলি শরীরচর্চার জন্য আবশ্যক, কিন্তু সেখানেও বাজি লাগানো হচ্ছে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ এতে অর্থ খুইয়ে সর্বস্বান্ত হয়। তারা বুঝতে পারে যে সব কিছু লুটে নিচ্ছে কিন্তু এমনভাবে তারা চোখ বন্ধ করে রাখে, পার্থিবতায় এতটাই নিমগ্ন হয়ে পড়ে যে নিজের সব কিছু হেরে যেতে দেখে সামলে ওঠার চিন্তা করবে, সেই সম্বিৎটুকুও তাদের অবশিষ্ট থাকে না। এছাড়া আনন্দ করার নামে হইহুল্লোড় আর নাচগান রয়েছে। ছেলে ও মেয়েরাও দল বানিয়ে ঘুরে বেড়ায় একে অপরের প্রতি বক্রোক্তি করে। দলবদ্ধভাবে একে অপর নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়। যুবকদের মধ্যে এই বিষয়টি এত বেশি প্রচলন পাচ্ছে যে আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও এখন উদ্বিগ্ন হতে শুরু করেছে আর তাদের উদ্বেগ দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ধরণের বিষয় যা মানুষকে জাগতিক কামনা-বাসনা এবং আড়ম্বরের দিকে নিয়ে যায় সেগুলিকেই বলা হয় 'লাহাও ও লা'আব' (ক্রীড়া-কৌতুক)। আর এগুলি আল্লাহ্ তা'লার নিকট উদ্দেশ্যহীন এবং জীবনরূপী পুরস্কারকে নষ্ট করার নামান্তর। এই জীবন হল আল্লাহ্ পক্ষ থেকে দেওয়া একটি দান বা পুরস্কার যা মানুষের কাজে লাগানো উচিত। কিন্তু এই দানকে কাজে না লাগিয়ে মানুষ নিজের জীবনকে ধ্বংস করছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর এই আয়াতে ক্রীড়া-কৌতুকের পর যে বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হল সৌন্দর্য প্রকাশ করা। অর্থাৎ বাহ্যিক রূপসজ্জা। এর মধ্যে বাহ্যিক পোশাক ও পরিপাটির কথাও রয়েছে, মেকআপ-এর সৌন্দর্যও রয়েছে, বাড়ির সৌন্দর্য ও সাজসজ্জাও রয়েছে। বস্তুত, সকল প্রকারের বাহ্যিক সৌন্দর্য রয়েছে। এর সৌন্দর্য প্রকাশের বিষয়টা বিশেষ করে করে মেয়েদের মধ্যে অনেক বেশি হয়ে থাকে। কেউ মেকআপ দিয়ে সাজে, কেউ নিজেকে গয়নাগাটি দ্বারা সাজিয়ে তোলে। কেউ আবার মহার্ঘ পোশাক পরে সৌন্দর্য ছড়ায়। কেউ আবার শরীর প্রদর্শন হয় এমন কেতাদুরন্ত পোশাক দ্বারা নিজেদের প্রকাশ করে। এছাড়া বর্তমানে এই সৌন্দর্য সৌন্দর্যের নামে নির্লজ্জতার রূপ পরিগ্রহ করেছে। লজ্জাশীলতার সমস্ত সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে। যেমনটি আমি বলেছি, পোশাক ক্রমশ অশালীন পোশাক হয়ে উঠছে। এছাড়াও বিরাট বিরাট বিজ্ঞাপন বোড , টিভি বিজ্ঞাপন, ইন্টারনেট বিজ্ঞাপন এমনকি পত্রপত্রিকার মাধ্যমেও এমন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যার উপর কোনও ভদ্রলোকের দৃষ্টি গেলে লজ্জায় দৃষ্টি অবনত করে আর দৃষ্টি অবনত করাও উচিত। আধুনিক সমাজ এবং আলোকিত চিন্তাধারার নামে এই সব কিছু হচ্ছে। যাইহোক যেমনটি আমি বলেছি, সৌন্দর্য এখন নির্লজ্জতার রূপ ধারণ করেছে। অর্থাৎ সৌন্দর্যে নামে নির্লজ্জতার প্রচার হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, বস্তুবাদির একটি বড় ব্যধি হল

এরপর ৮ এর পাতায়

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

জুমআর খুতবা

একবার মহানবী (সা.) সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, আমি তোমাদেরকে অনেক আদেশ দিয়েছি, কিন্তু আমি তোমাদের সবচেয়ে নিষ্ঠাবান লোকদের মাঝেও কখনো কখনো অভিযোগ করার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি। কিন্তু আবু বকরের মাঝে আমি এরূপ মনোভাব কখনো দেখতে পাইনি।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদাবান সাহাবী এবং খলীফায়ে রাশেদ হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর ঈমান উদ্দীপক বর্ণনা।

মাননীয় সামিউল্লাহ্ সিয়াল সাহেব, উকিলু যারাআত তাহরিকে জাদীদ আঞ্জুমান আহমদীয়া রাবোয়া-এর এবং মাননীয় সিদ্দীকা বেগম সাহেবা-র মৃত্যু সংবাদ ও স্মৃতিচারণ।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ২৩ শে সেপ্টেম্বর, ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (২৩ তাবুক, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছিল। আজও এই ধারা বজায় থাকবে। হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, কুরআনের আয়াত-

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ

অর্থাৎ, এবং সেসব মানুষ যারা আহত হওয়ার পরেও আল্লাহ্ এবং রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মাঝে যারা পুণ্যকাজ করেছে করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে এক মহা প্রতিদান (সূরা আলে ইমরান : ১৭৩)। এই বিষয়ে তিনি (অর্থাৎ, হযরত আয়েশা) উরওয়াকে বলেন, হে আমার ভাগ্নে! যখন মহানবী (সা.) উহুদের যুদ্ধে আহত হন আর মুশরিকরা চলে গিয়েছিল তখন হুযূর (সা.)-এর আশংকা হয়, পাছে (তারা) আবার ফিরে না আসে। তিনি (সা.) বলেন, কে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে? তখন তাদের মধ্যে থেকে ৭০ জন মানুষ নিজেদের উপস্থাপন করেন, আর তোমার পিতা হযরত যুবায়ের এবং হযরত আবু বকর (রা.) তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উরওয়া বলতেন, তাঁদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.)ও ছিলেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, রেওয়ায়েত নম্বর-৪০৭৭)

উহুদের যুদ্ধের পর আবু সুফিয়ান যখন গিরিপথে ছিল আর সে বলছিল, আগামী বছর এই দিনেই বদরের প্রান্তরে পুনরায় যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি থাকলো এবং মহানবী (সা.) তার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন, তখন আবু সুফিয়ান দ্রুত তার সেনাদল নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। এর পরের ঘটনা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) বাড়তি সতর্কতা হিসেবে তৎক্ষণাৎ ৭০জন সাহাবীর একটি দল প্রস্তুত করে কুরাইশ বাহিনীর পেছনে প্রেরণ করেন যাদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এটি বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত। সাধারণ ঐতিহাসিকগণ এভাবে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.) অথবা কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রা.)-কে কুরাইশদের পেছনে প্রেরণ করেন; আর তাদেরকে বলেন, কুরাইশ সৈন্যরা পুনরায় মদীনা আক্রমণের ষড়যন্ত্র করছে কিনা খবর নাও। মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, যদি কুরাইশ বাহিনী উটে আরোহিত থাকে এবং ঘোড়াগুলোকে আরোহীবিহীন নিয়ে যায় তাহলে বুঝবে, তারা মক্কার উদ্দেশ্যে ফেরত যাচ্ছে আর মদীনায় আক্রমণ করার ইচ্ছা রাখে না। আর তারা যদি অশ্বারোহী থাকে তাহলে বুঝবে তাদের উদ্দেশ্য শুভ নয়। তিনি (সা.) তাদেরকে জোরালো নির্দেশ দেন যে, কুরাইশ বাহিনী যদি মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁকে অবহিত করা হয়। আর তিনি (সা.) অত্যন্ত তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলেন, কুরাইশরা যদি এখন মদীনায় আক্রমণ করে তাহলে খোদার কসম! আমরা তাদের মোকাবিলা করে তাদেরকে এই আক্রমণ করার মজা টের পাইয়ে দেবো। অতএব, মহানবী (সা.)-এর প্রেরিত লোক তাঁর নির্দেশ অনুসারে যান এবং অতি দ্রুত এই সংবাদ নিয়ে ফিরে আসেন যে, কুরাইশ বাহিনী মক্কার দিকে ফিরে যাচ্ছে।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৯৯-৫০০)

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, আমাদের সাথে উম্মে আয়মানের কাছে চলুন, তাকে দেখে আসি; যেভাবে মহানবী (সা.) তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। তিনি অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা যখন তার কাছে যাই তখন তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন। তারা উভয়ে বলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহ্ তা'লার কাছে যা আছে তা তাঁর রসূলের জন্য উত্তম। তিনি বলেন, আমি জানি; যা আল্লাহ্ তা'লার কাছে আছে তা তাঁর রসূলের জন্য উত্তম। কিন্তু আমার কান্নার কারণ হলো, এখন আকাশ থেকে ওহী অবতরণের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হযরত আনাস (রা.) বলেন, তিনি অর্থাৎ উম্মে আয়মান তাদের উভয়কেও কাঁদিয়ে ফেলেন; অর্থাৎ উভয়ে তার সাথে কাঁদতে থাকেন।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল জানায়েজ,হাদীস-১৬৩৫)

মহানবী (সা.) বলেন, হে লোকসকল! আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন, অথচ তোমরা বলেছ, 'তুমি মিথ্যাবাদী'; আর আবু বকর বলেছিল, 'আপনি সত্যবাদী'। আর সে নিজ প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছে।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযাইলিল আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৬৬১)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, "কেবল আবু বকর (রা.)-ই এমন মানুষ ছিলেন যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আমাকে অস্বীকার করেছিলে, কিন্তু আবু বকর এমন ছিল যার মাঝে আমি কোন প্রকার বক্রতা দেখিনি।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৬, পৃ: ২৭৭-২৭৮)

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় যখন মহানবী (সা.) এবং মক্কার কুরাইশদের মাঝে সন্ধিচুক্তি (সম্পাদিত) হচ্ছিল আর আবু জন্দলকে মহানবী (সা.) চুক্তির শর্তানুযায়ী ফেরত পাঠিয়ে দেন, তখন সাহাবীরা খুবই আবেগাপ্লুত ও উত্তেজিত ছিলেন। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, মুসলমানরা এই দৃশ্য দেখছিল এবং ধর্মীয় আত্মাভিমানে তাদের চোখ রক্তিম হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সামনে জড়োসড়ো দাঁড়িয়ে ছিলেন। অবশেষে হযরত উমর (রা.) আর সইতে পারেন নি। তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং কম্পিত কণ্ঠে বলেন, আপনি কি খোদার সত্য রসূল নন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমরা কি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নই এবং আমাদের শত্রুরা কি মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই এমনটিই। হযরত উমর (রা.) পুনরায় বলেন, তাহলে আমরা আমাদের সত্য ধর্মের এমন লাঞ্ছনা কেন সহ্য করবো? তিনি (সা.) হযরত উমর (রা.)'র (এহেন) অবস্থা দেখে সংক্ষিপ্ত বাক্যে বলেন, দেখ উমর! আমি আল্লাহ্র রসূল এবং আমি খোদার অভিপ্রায় কী তা জানি। আমি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারি না, কেননা তিনিই আমার সাহায্যকারী। কিন্তু হযরত উমর (রা.)'র প্রকৃতিগত উত্তেজনা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি বলেন, আপনি কি আমাদেরকে বলেননি যে, আমরা বায়তুল্লাহ্ বা কা'বাগৃহ তওয়াফ করবো? তিনি (সা.) বলেন, আমি অবশ্যই বলেছিলাম; কিন্তু আমি কি একথাও বলেছিলাম যে, এই তওয়াফ অবশ্যই এ বছরই হবে? হযরত উমর (রা.) বলেন, না, এমনটি বলেন নি। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে অপেক্ষা করো, তোমরা ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই মক্কায় প্রবেশ করবে এবং কা'বা তওয়াফ করবে। কিন্তু উত্তেজিত অবস্থায় হযরত উমর (রা.) আশ্বস্ত হতে পারেন নি। যেহেতু মহানবী (সা.)-এর একটি বিশেষ প্রতাপ ছিল, তাই

হযরত উমর (রা.) সেখান থেকে সরে গিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে আসেন এবং তার সাথেও এ ধরনের উত্তেজিত অবস্থায় কথাবার্তা বলেন। হযরত আবু বকর (রা.)ও একই ধরনের উত্তর দেন যেমনটি মহানবী (সা.) দিয়েছিলেন; কিন্তু একইসাথে হযরত আবু বকর (রা.) উপদেশের স্বরে বলেন, দেখ উমর! সংযত হও। আর আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর রশিতে যে হাত রেখেছ তা শিথিল হতে দিও না; কেননা খোদার কসম! এই ব্যক্তি যাঁর হাতে আমরা হাত রেখেছি, তিনি অবশ্যই সত্য।

হযরত উমর (রা.) বলেন, সেসময় আমি উত্তেজনার বশে এসব কথা বলে বসেছিলাম ঠিকই, কিন্তু পরে আমার চরম অনুশোচনা হয় আর তওবার আদলে এই দুর্বলতার দাগ মোচন করার জন্য অনেক নফল ইবাদত করেছি। অর্থাৎ, সদকা করেছি, রোযা রেখেছি, নফল নামায পড়েছি এবং দাস মুক্ত করেছি, যাতে আমার এই দুর্বলতার দাগ মুছে যায়।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৭৬৭-৭৬৮)

এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও লিখেছেন বা বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, একবার মহানবী (সা.) সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, আমি তোমাদেরকে অনেক আদেশ দিয়েছি, কিন্তু আমি তোমাদের সবচেয়ে নিষ্ঠাবান লোকদের মাঝেও কখনো কখনো অভিযোগ করার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি। কিন্তু আবু বকরের মাঝে আমি এরূপ মনোভাব কখনো দেখতে পাইনি।

যেমন হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় হযরত উমর (রা.)'র ন্যায় মানুষও বিচলিত হয়ে পড়েন; আর তিনি সেই বিচলিত অবস্থাতেই হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে যান এবং বলেন, আমাদের সাথে কি খোদা তা'লার এই প্রতিশ্রুতি ছিল না যে, আমরা উমরা করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ, খোদার প্রতিশ্রুতি ছিল। তিনি বলেন, আমাদের সাথে কি খোদার এই প্রতিশ্রুতি ছিল না যে, তিনি আমাদের সমর্থন ও সাহায্য করবেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন যে, হ্যাঁ, ছিল। তিনি বলেন, তাহলে কি আমরা উমরা করেছি?

হযরত আবু বকর বলেন, হে উমর! খোদা তা'লা কখন বলেছিলেন যে, আমরা এ বছরই উমরা করব? অতঃপর তিনি বলেন, আমরা কি বিজয় ও সাহায্য লাভ করেছি? হযরত আবু বকর বলেন, খোদা ও তাঁর রসূল বিজয় ও সাহায্যের অর্থ আমাদের চেয়ে ভালো জানেন। কিন্তু উমর (রা.) এই উত্তরে সন্তুষ্ট হন নি। আর তিনি এই বিচলিত অবস্থাতেই মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছেন এবং নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! খোদা তা'লার কি আমাদের সাথে এই প্রতিশ্রুতি ছিল না যে, আমরা তাওয়াফরত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি নিবেদন করেন, আমরা কি খোদার জামা'ত নই আর খোদা তা'লার কি আমাদের সাথে বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ছিল না? তিনি বলেন, ছিল। হযরত উমর বলেন, তাহলে হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কি উমরা করেছি? তিনি বলেন, খোদা তা'লা কখন বলেছিলেন যে, আমরা এ বছরই উমরা করব? এটি তো আমার ধারণা ছিল যে, এ বছরই উমরা হবে। খোদা তা'লা তো নির্দিষ্ট করে বলেন নি। তিনি বলেন, তাহলে বিজয় ও সাহায্যের কী অর্থ হলো? তিনি (সা.) বলেন, খোদার সাহায্য অবশ্যই আসবে আর তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) যে উত্তর দিয়েছিলেন সেই একই উত্তর মহানবী (সা.)ও প্রদান করেন। "

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৮২)

এই উভয় রেওয়ায়েতে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, একটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত উমর প্রথমে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়েছিলেন, এরপর হযরত আবু বকরের কাছে গিয়েছিলেন। আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যা বর্ণনা করেছেন তাতে মূল কথা একই, কিন্তু এ অনুসারে প্রথমে হযরত আবু বকরের কাছে গিয়েছেন, এরপর মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়েছেন।

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, দুই ব্যক্তি একে অপরকে ভর্ৎসনা করে। একজন ছিল মুসলমান আর অপরজন ছিল ইহুদি। মুসলমান ব্যক্তি বলে, সেই সত্তার কসম যিনি মুহাম্মদ (সা.)-কে পুরো বিশ্বজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তখন ইহুদি ব্যক্তি বলে, সেই সত্তার কসম যিনি মূসা (আ.)-কে পুরো বিশ্ব জগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এতে মুসলমান ব্যক্তি হাত উঠায় আর ইহুদি ব্যক্তির মুখে থাপ্পড় মারে। সেই ইহুদি ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে যায় এবং তার ও সেই মুসলমানের মাঝে যা ঘটেছে তা তাঁকে অবগত করে। তখন মহানবী (সা.) উক্ত মুসলমান ব্যক্তিকে ডাকেন আর তিনি (সা.) তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সেই ব্যক্তি তাঁর (সা.) কাছে সব খুলে বলে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমাকে মূসার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল খুসুমাত, হাদীস-২৪১১) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখা আছে যে, যেই মুসলমান সেই ইহুদিকে চপেটাঘাত করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,তিনি (সা.) বিধর্মীদের আবেগ-অনুভূতির প্র তিও অনেক যত্নবান ছিলেন। একবার হযরত আবু বকরের সামনে কোন ইহুদি বলে বসে যে, আমি মূসার কসম খাচ্ছি যাকে খোদা তা'লা সকল নবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এতে হযরত আবু বকর তাকে চপেটাঘাত করেন। মহানবী (সা.) যখন এই ঘটনা জানতে পারেন তখন তিনি (সা.) হযরত আবু বকরের ন্যায় মানুষকে ভর্ৎসনা করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, লক্ষ্য করে দেখ! মুসলমানদের শাসন চলছে। এক ইহুদি মহানবী (সা.)-এর ওপর হযরত মূসাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে আর এমনভাবে কথা বলে যে, হযরত আবু বকরের ন্যায় নম্র হৃদয়ের মানুষও উত্তেজিত হয়ে পড়েন আর তাকে থাপ্পড় দেন। কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে তিরস্কার করেন এবং বলেন যে, তুমি কেন এমন করেছ? তার যা ইচ্ছা বিশ্বাস পোষণ করার অধিকার আছে। (তফসীর কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫৩১)

যদি এটি তার বিশ্বাস হয়ে থাকে তাহলে তার একথা বলার অধিকার রয়েছে।

মহানবী (সা.)-এর প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রেম ও ভালোবাসার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রেমময় সম্পর্ক ছিল । তিনি যখন মদিনায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে যাত্রা করেন তখনও তার সম্পর্ক প্রেমিকসুলভ ছিল, আর যখন তাঁর মৃতুর সময় হয় তখনও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। যেমন, মহানবী (সা.)-এর প্রতি যখন

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

(সূরা আন্ নাসর)

ওহী অবতীর্ণ হয় যাতে তাঁর (সা.) মৃত্যুর সংবাদ প্রচ্ছন্ন ছিল, তখন মহানবী (সা.) খুতবা প্রদান করেন এবং তাতে উক্ত সূরা অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা নিজের এক বান্দাকে স্বীয় সাহচর্য ও জাগতিক উন্নতির মধ্য থেকে একটি বেছে নেয়ার সুযোগ দিয়েছেন; আমি খোদা তা'লার সাহচর্যকে প্রাধান্য দিয়েছি। এই সূরা শুনে সকল সাহাবীর চেহারা আনন্দে ঝলমল করে উঠে। আর সবাই আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চকিত করতে আরম্ভ করেন এবং বলতে থাকেন যে, আলহামদুলিল্লাহ্, এখন সেই দিন আসতে যাচ্ছে! কিন্তু যখন অন্য সবাই আনন্দিত ছিল, হযরত আবু বকর (রা.) ডুকরে কেঁদে উঠেন এবং ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার জন্য আমাদের পিতা-মাতা এবং স্ত্রী-সন্তান সবাই উৎসর্গিত। আপনার জন্য আমরা সবকিছু কুরবানী করতে প্রস্তুত আছি।

অর্থাৎ যেভাবে কোনো প্রিয়জন রোগাক্রান্ত হলে ছাগল জবাই করা হয়, সেভাবেই হযরত আবু বকর নিজেকে ও নিজের সকল প্রিয়জনকে মহানবী (সা.)-এর জন্য উৎসর্গ করেছেন।

তাঁর কান্না দেখে আর এই কথা শুনে কতিপয় সাহাবী বলেন যে, দেখ, এই বৃদ্ধের কী হয়েছে! আল্লাহ্ তা'লা কোনো বান্দাকে সুযোগ দিয়েছেন যে, সে (খোদার) সাহচর্য বা জাগতিক উন্নতিকে বেছে নিতে পারে, আর সে (খোদার) সাহচর্য গ্রহণ করেছে; এই ব্যক্তি কেন কাঁদছে? এখানে তো ইসলামের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। এমনকি হযরত উমরের ন্যায় মহান সাহাবীও এতে আশ্চর্য হন। মহানবী (সা.) মানুষের এই বিস্ময়কে অনুভব করেন এবং হযরত আবু বকরের অস্থিরতাকে দেখেন ও তার **সান্ত্বনার** জন্য বলেন, আবু বকর আমার কাছে এত প্রিয় যে, খোদা তা'লাকে ছাড়া যদি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানো বৈধ হতো তাহলে আমি তাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম; কিন্তু এখনও সে আমার বন্ধু ও সাহাবী। অতঃপর বলেন, আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, আজ থেকে আবু বকরের জানালা ব্যতিরেকে মসজিদের দিকে যত জানালা খুলে, সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হোক। এভাবে মহানবী (সা.) তাঁর ভালোবাসার সম্মান দিয়েছেন, কেননা এই ভালোবাসা পরিপূর্ণ ছিল যা হযরত আবু বকর (রা.)-কে জানিয়ে দিয়েছিল যে, এই বিজয় ও সাহায্যের সংবাদের পেছনে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ (লুক্কায়িত) রয়েছে। তিনি নিজের এবং নিজ প্রিয়জনদের প্রাণ নিবেদন করে বলেন, আমাদের জীবনের বিনিময়ে হলেও আপনি জীবিত থাকুন। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতেও হযরত আবু বকর ভালোবাসার এক উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বস্তুতঃ হযরত আবু বকর সওর গুহায় নিজ প্রাণের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেননি, বরং

মহানবী (সা.)-এর জন্য তা প্রকাশ করেছিলেন। আর এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা তাকে বিশেষভাবে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন। "

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৬, পৃ: ৮১৪-৮১৫)

প্রতিটি ক্ষেত্রে, যেখানেই (উৎকণ্ঠা) প্রকাশ করেছেন সেখানে মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসার কারণে তা করেছেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একস্থলে বলেন, "বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একবার হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)'র মাঝে কোন এক বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয় আর বিতর্ক বৃদ্ধি পেতে থাকে। হযরত উমর (রা.) যেহেতু রাগী স্বভাবের ছিলেন তাই হযরত আবু বকর (রা.) সেখান থেকে চলে যাওয়াই সমীচীন মনে করলেন যেন বিবাদ শুধু শুধু সীমা ছাড়িয়ে না যায়। হযরত আবু বকর (রা.) চলে যেতে উদ্যত হলে হযরত উমর (রা.) এগিয়ে গিয়ে তাঁর জামা টেনে ধরে বলেন, আমার কথার উত্তর দিয়ে যান। হযরত আবু বকর (রা.) জামা ছাড়িয়ে চলে যেতে চাইলে তার জামা ছিঁড়ে যায়। হযরত আবু বকর (রা.) তার ঘরে চলে আসেন, কিন্তু হযরত উমর (রা.) ভাবলেন, হয়তো হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করতে গিয়েছেন। তাই তিনিও রওয়ানা হন যেন তিনিও মহানবী (সা.)-এর সকাশে নিজ অজুহাত উপস্থাপন করতে পারেন। কিন্তু পথিমধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)'র দৃষ্টির আড়াল হয়ে যান। হযরত উমর (রা.) এটিই ভাবতে থাকেন যে, তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাশে নালিশ করার জন্য গেছেন। এই ভেবে তিনি সোজা মহানবী (সা.)-এর সকাশে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে গিয়ে দেখেন, হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে উপস্থিত নেই। কিন্তু যেহেতু তার হৃদয়ে অনুতাপ ছিল তাই তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার ভুল হয়ে গেছে, আ মি আবু বকর (রা.)'রসাথে কঠোর আচরণ করেছি। হযরত আবু বকর (রা.)'র কোন দোষ নেই, বরং আমারই দোষ। হযরত উমর (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন তখন হযরত আবু বকর (রা.)-কে কেউ গিয়ে বলে যে, হযরত উমর মহানবী (সা.)-এর কাছে আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করতে গিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.)'র মনে এই ভাবোদয় হয় যে, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আমার যাওয়া উচিত, যেন একতরফা কথা না হয় আর আমিও যেন আমার দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করতে পারি। হযরত আবু বকর (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর বৈঠকে উপস্থিত হন তখন হযরত উমর নিবেদন করছিলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি আবু বকর (রা.)'র সাথে বাকবিতণ্ডা করেছি আর আমার দ্বারা তার জামা ছিঁড়ে গেছে। মহানবী (সা.) একথা শুনার পর তাঁর চেহারায় রাগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। তিনি (সা.) বলেন, হে লোকসকল! তোমাদের কী হয়েছে? সারা জগৎ যখন আমাকে অস্বীকার করে আর তোমরাও আমার বিরোধী ছিলে, তখন আবু বকরই আমার প্রতি ঈমান এনেছে এবং সকল অর্থে আমায় সহযোগিতা করেছে।

তিনি মনক্ষুণ্ন হয়ে বলেন, তোমরা কি এখনো আমাকে এবং আবু বকরকে ছাড়বে না? তিনি একথা বলছিলেন, এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) প্রবেশ করেন। "

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সত্যিকার প্রেমের দৃষ্টান্ত এরূপই হয়। হযরত আবু বকর (রা.) যখন সেখানে প্রবেশ করেন তখন তিনি কী পন্থা অবলম্বন করেছেন- এ শিরোনামে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলছেন, সত্যিকার প্রেমের দৃষ্টান্ত এরূপই হয়; কোনরূপ অজুহাত উপস্থাপন না করে, অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্র রসূল! আমার দোষ ছিল না, বরং উমরের দোষ ছিল'- একথা না বলে তিনি যখন দেখলেন, মহানবী (সা.)-এর মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে, তখন এক সত্যিকার প্রেমিক হিসেবে তিনি এটি সহ্য করতে পারেন নি যে, আমার কারণে মহানবী (সা.)-এর কোনরূপ কষ্ট হবে। তিনি উপস্থিত হয়েই মহানবী (সা.)-এর সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়েন এবং নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহর রসূল! উমরের কোন দোষ ছিল না, দোষ আমার!' দেখ, হযরত আবু বকর (রা.) কত নিষ্ঠাবান প্রেমিক ছিলেন! তাঁর প্রেমাস্পদের মনে কোনরূপ কষ্ট হোক তিনি তা সহ্য করতে পারেন নি। রসূল (সা.)-কে হযরত উমর (রা.)'র প্রতি অসন্তুষ্ট হতে দেখে হযরত আবু বকর (রা.) আনন্দিত হন নি। সাধারণত মানুষের স্বভাব হলো, যখন সে নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে বকা খেতে দেখে তখন খুশি হয় আর ভাবে যে, 'ভালোমতো বকা খেয়েছে!' কিন্তু মহানবী (সা.) কোনরূপ কষ্ট পাবেন- এই সত্যিকার প্রেমিক সেটি পছন্দ করেন নি। তিনি (মনে মনে) বলেন, 'আমিই (বরং) অপরাধী হয়ে যাই, তবুও আমি আমার প্রেমাস্পদকে মর্মাহত হতে দিব না।' আর পরম বিনয়ের সাথে বলেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল! উমরের কোন দোষ ছিল না; অপরাধ আমার।' হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) যদি মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ের কষ্ট লাঘব করার উদ্দেশ্যে নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও অপরাধী হওয়ার স্বীকারোক্তি দেন আর এজন্য তিনি মনে কোন কষ্ট না পান, তাহলে এটি কিভাবে সম্ভব যে খোদার সন্তুষ্টির জন্য একজন মু'মিন বান্দা সেকাজ করবে না? "

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৭, পৃ: ৩৩১-৩১৪)

একজন মু'মিনেরও বৈশিষ্ট্য এটিই হওয়া উচিত যে, সে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করবে এবং এমন কোন কাজ করবে না যাতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন ।

এরপর হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একস্থানে বর্ণনা করেন,একবার হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট তওরাতের একটি কপি নিয়ে এসে বলেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল! এটি তওরাত।' মহানবী (সা.) তাঁর কথা শুনে নীরব হয়ে যান, কিন্তু হযরত উমর (রা.) তওরাত খুলে পড়া আরম্ভ করেন। ফলে মহানবী (সা.)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির চিহ্ন প্রকাশ পায়।

হযরত আবু বকর (রা.) বিষয়টি লক্ষ্য করে হযরত উমর (রা.)'র প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তিনি (রা.) বলেন, 'তুমি কি দেখছ না, মহানবী (সা.)এটি অপছন্দ করছেন?'

তাঁর কথা শুনে হযরত উমর (রা.)'রও এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর চেহারার প্রতি তাকিয়ে যখন মহানবী (সা.)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করেন, তখন তিনি (রা.) তাঁর (সা.) কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। "

(তফসীর কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৫৩)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনাটি একটি আয়াতের তফসীরে বর্ণনা করেছেন। মহানবী (সা.)-এর অসন্তুষ্টি মূলতঃ হযরত উমর (রা.)'র তওরাতের এমন আয়াত পাঠ করার কারণে ছিল যা ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থী ছিল; এই অসন্তুষ্টি নিছক তওরাত পাঠ করার কারণে ছিল না। কারো যদি এর তফসীর পাঠ করার আগ্রহ থাকে তাহলে তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ডে সূরা নূরের ৩য় আয়াতের আলোচনায় এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তফসীর লিপিবদ্ধ রয়েছে; সেখানে দেখে নিতে পারেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "সাহাবীগণ মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য যেভাবে করতেন তার প্রমাণ হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে সম্পৃক্ত একটি ঘটনায় বিদ্যমান। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর যখন আরবের কতক গোত্র যাকাত প্রদানে অস্বীকার করে তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তখন পরিস্থিতি এতটাই নাজুক ছিল যে হযরত উমর (রা.)'র মত মানুষ তাঁকে তাদের সাথে নমনীয়তা প্রদর্শন করার পরামর্শ দেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) জবাবে বলেন,

'মহানবী (সা.) স্বয়ং যে আদেশ প্রদান করেছেন, আবু কোহাফার পুত্রের তা রহিত করার কী ক্ষমতা আছে? খোদার কসম! মহানবী (সা.)-এর যুগে এরা যদি উটের পা বাঁধার রশিও যাকাত হিসেবে প্রদান করতো, তবে আমি সেই রশিও তাদের কাছ থেকে নিয়ে ছাড়ব আর তাদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে তবেই ক্ষান্ত হব।'

এটি বুখারীর রেওয়ায়েত। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, "এ ব্যাপারে তোমরা যদি আমাকে সাহায্য করতে না পারো তাহলে করো না; আমি একাই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।' নবীর আনুগত্যের এ কত বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত!চরম বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ সাহাবীগণের লড়াই না করার পরামর্শ প্রদান সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর আদেশ বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি (রা.) সব ধরনের বিপদ মাথা পেতে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান!একইভাবে উসামা (রা.)'র বাহিনীর (যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্যে) যাত্রা স্থগিত করার জন্য সাহাবীরা অনেক চেষ্টা করেন; কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, 'শত্রু যদি মদীনা দখল করার মত শক্তি অর্জন করে নেয় আর মুসলিম নারীদের লাশ নিয়ে কুকুর যদি টানা-হেঁচড়াও করে, তবুও আমি সেই সেনাবাহিনী প্রেরণ স্থগিত করতে পারি না যা স্বয়ং মহানবী (সা.) প্রেরণ করার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন।"

(তফসীর কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১০৮-১০৯)

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, আমার কাছে যদি বাহরাইনের ধনসম্পদ আসে তাহলে আমি তোমাকে এতটা এতটা করে দিব। [হাতের ইশারায় বলেছিলেন।] কিন্তু সেই সম্পদ তখন (মুসলমানদের) হস্তগত হয় যখন মহানবী (সা.)-এর প্রয়াণ হয়ে গিয়েছিল। বাহরাইনের সম্পদ যখন হস্তগত হয় তখন হযরত আবু বকর (রা.) ঘোষককে নির্দেশ দেন; [অর্থাৎ ঘোষণা করান] এবং সে ঘোষণা দেয় , 'মহানবী (সা.)-এর কাছে কারো যদি কোনো পাওনা থাকে অথবা [তিনি (সা.)] কাউকে কিছু দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তাহলে সে যেন আমাদের কাছে আসে।' বর্ণনাকারী বলেন, এই ঘোষণা শুনে আমিও তাঁর কাছে যাই এবং বলি, 'মহানবী (সা.) আমাকে এরূপ এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।' তখন হযরত আবু বকর (রা.) আমাকে তিন অঞ্জলি ভরে ভরে দিলেন। [অর্থাৎ

তিনবার দু'হাত ভরে দিলেন]। আলী বিন মাদিনী বলেন, সুফিয়ান (রা.) উভয় হাত একত্রিত করে পূর্ণ অঞ্জলি নির্দেশ করেন যে, এভাবে তিনবার দিয়েছেন।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবু ফারযুল খুমস, হাদীস-৩১৩৭, উর্দু অনুবাদ, নাযারত ইশাআত, রাবোয়ায়া, পৃ: ৪৮৫-৪৮৬)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, বাহরাইন থেকে যখন ধনসম্পদ এল তখন আমি হযরত আবু বকর (রা.)'র ঘোষককে একথা বলতে শুনলাম যে, যাকে মহানবী (সা.) কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে যেন আসে। লোকেরা হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে আসলে তাদেরকে তিনি (রা.) (সেই সম্পদ থেকে) প্রদান করতেন। এরপর হযরত আবু বশীর মা'যানী (রা.) আসেন। তিনি (রা.) বলেন, "মহানবী (সা.) বলেছিলেন, 'হে আবু বশীর! আমাদের কাছে যখন কোনো ধনসম্পদ আসবে তখন আমাদের কাছে এসো।'" তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাকে দুই অথবা তিন 'লাব' (অঞ্জলি ভরে) দিলেন যা গণনা করে তিনি ১৪শ' দিরহাম বুঝে পেলেন।

(আত্তাবাকাতু কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪৩)

[লাব শব্দের অর্থ হলো দু'হাত ভরে]।

একদা হযরত আবু বকর (রা.) সাহাবায়ে কেরামের সাথে আলাপচারিতায় মগ্ন ছিলেন এবং কিছুক্ষণ পর তিনি নিজ সেবককে বললেন, 'আমাকে পানি পান করাও।' সেবক কিছুক্ষণ পর একটি মাটির পাত্রে পানি নিয়ে এলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) উভয় হাত দিয়ে পানপাত্র ধরলেন এবং পিপাসা নিবারণের জন্য নিজের মুখের কাছে নিয়ে আসতেই তিনি দেখলেন যে, পাত্র পানি মিশ্রিত মধুতে পরিপূর্ণ রয়েছে। তিনি (রা.) সেই পাত্রটি রেখে দিলেন এবং পানি পান করলেন না। এরপর সেবকের দিকে তাকালেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটি কী?' সেবক বলল, 'পানিতে মধু মিশিয়ে দিয়েছি।' হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) পানি গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকলেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই তাঁর চোখ থেকে অশ্রুবন্যা বইতে লাগলো। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কান্নার স্বর আরও উঁচু হয়ে গেল এবং তিনি ভীষণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

লোকেরা তাঁর প্রতি মনোযোগী হলো এবং সান্ত্বনা দিতে লাগলো আর বলল, 'হে রসূলের খলীফা! আপনার কী হয়েছে? আপনি এত বেশি কেন কাঁদছেন? আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আপনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেন কাঁদছেন?' কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কান্না থামালেন না, বরং আশপাশের সকলেও তাঁকে দেখে কান্না শুরু করল এবং কাঁদতে কাঁদতে তারা নীরবও হয়ে গেল, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) অনবরত কাঁদতেই থাকলেন। তাঁর অশ্রু যখন সামান্য সংবরণ হল তখন লোকেরা তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করল যে, 'হে রসূল (সা.)-এর খলীফা! কী কারণে এত কান্নাকাটি? কিসে আপনাকে এত কাঁদালো?' হযরত আবু বকর (রা.) নিজ কাপড়ের আঁচল দিয়ে অশ্রু মুছতে মুছতে নিজেকে সংবরণ করে বললেন, 'আমি মহানবী (সা.)-এর মুমূর্ষু অবস্থার দিনগুলোতে তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম। আমি মহানবী (সা.)-কে দেখলাম, তিনি নিজ হাত দ্বারা কোনো কিছুকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু সে বস্তুটি আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। তিনি ক্ষীণস্বরে বলছিলেন, 'আমার থেকে দূর হও, আমার থেকে দূর হয়ে যাও!' আমি এদিক-সেদিক তাকালাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমি আপনাকে দেখলাম কোনো বস্তুকে আমি নিজের থেকে দূরে সরাচ্ছেন, অথচ আপনার আশপাশে কিছু দৃশ্যমান ছিল না।' হুযুর (সা.) আমার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে বললেন, 'এটি মূলতঃ দুনিয়া ছিল যা নিজের সকল চাকচিক্য ও নেয়ামতসহ আমার সামনে উপস্থিত হয়েছিল। আমি তাকে বলছিলাম, দূর হয়ে যাও। [কাশফের (তথা দিব্যদর্শনের) একটি অবস্থা তাঁর ওপর বিরাজ করছিল।] সে এ কথা বলতে বলতে চলে গেল, 'আপনি আমার থেকে মুক্তি লাভ করেছেন তাতে কী! যারা আপনার পরে আসবে তারা আমার হাত থেকে কখনও বাঁচতে পারবে না'।' হযরত আবু বকর (রা.) দুশ্চিন্তায় নিজের মাথা নাড়লেন এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বললেন, 'হে লোকসকল! এই মধু মিশ্রিত পানির কারণে আমি ভয় পেলাম যে এই পার্থিবতা যেন আমাকে ঘিরে না ফেলে; এই কারণে আমি ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম।' [হৃদয়ে তিনি এতটাই আল্লাহ্ তা'লার ভয় লালন করতেন।]

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক কে ১০০ কিস্সে, পৃ: ৬৮-৭০) (হুলিয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০-৩১)

ইরাক বিজয়ের পর একটি মূল্যবান চাদর হস্তগত হয়। হযরত খালেদ (রা.) সেনাবাহিনীর পরামর্শে সেই চাদরটি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র কাছে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন আর লিখেন, 'আপনার জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে, আপনি এটি গ্রহণ করুন।' কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তা নেওয়া পছন্দ করেন নি, এমনকি নিজের আত্মীয়দেরও দেন নি; বরং এটি হযরত ইমাম হুসায়েন (রা.)'র হাতে সোপর্দ করেন।

(সৈয়্যদানা সিদ্দীক আকবর কে শব ও রোয, পৃ: ১০৭)

অবশিষ্ট স্মৃতিচারণ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে হবে।

এখন আমি দু 'জন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাচ্ছি এবং এরপর তাদের গায়েবানা জানাযাও পড়াবো, ইনশাআল্লাহ্।

প্রথম জানাযা মোহতরম সামীউল্লাহ সিয়াল সাহেবের, যিনি তাহরীকে জাদীদের উকিলুয যিরাআত ছিলেন। উননব্বই (৮৯) বছর বয়সে ঐশী তকদীর অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করেন, ***ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।*** । আল্লাহ্ তা'লার কৃ পায় মরহুম মূসী ছিলেন। তার পিতা ছিলেন রহমতুল্লাহ সিয়াল সাহেব। সামীউল্লাহ সিয়াল সাহেবের বংশে আহমদীয়াত আসে তার পিতা রহমতুল্লাহ সিয়াল সাহেবের মাধ্যমে , যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)'র যুগে ১৯৩৮ সালে বয়আত গ্রহণ করেন। সে সময় সামীউল্লাহ সিয়াল সাহেবের বয়স ছিল চার বছর। যখন তার মাতা বয়আতের সংবাদ পান তখন নিজ স্বামীকে পরিত্যাগ করে তাঁকে সাথে নিয়ে চলে যান। যখন এই ঘটনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র সমীপে উপস্থাপন করা হয় তখন হুযুর তার পিতাকে বলেন, 'আপনি মামলা করুন এবং সন্তান ফেরত নিন।' তদনুযায়ী মামলা করে সন্তান ফেরত নেওয়া হয়। এভাবে তিনি তার পিতার অভিভাবকত্বে চলে আসেন আর তিনিই তার লালন-পালন করেন।

সামীউল্লাহ সিয়াল সাহেবের পিতা বিশৃঙ্খলার সময় পূর্ব পাঞ্জাবে শহীদ হয়েছিলেন। এরপর তার সকল অআহমদী আত্মীয়-স্বজন তাঁকে ফেরত নেওয়ার চেষ্টা করে, জামা'ত থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা করে; কিন্তু তিনি আহমদীয়াত পরিত্যাগ করেন নি। ১৯৪৯ সালে তা'লীমুল ইসলাম হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৫৪ সালে তা'লীমুল ইসলাম কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। এরপর ১৯৫৬ সালে লাহোর সরকারী কলেজ থেকে পরিসংখ্যানে এম.এ পাশ করেন। তার দুই পুত্র; একজন কানাডাতে ডাক্তারি করেন, অপরজন ইফতিখারুল্লাহ সিয়াল সাহেব যিনি রাবওয়াতে তাহরীকে জাদীদের ইনচার্জ; তিনি একজন ওয়াকেফে যিন্দেগী (জীবন উৎসর্গকারী)। ১৯৪৯ সালে সিয়াল সাহেব জীবন উৎসর্গ করেন এবং অন্যান্য ওয়াকফে যিন্দেগীদের সাথে তার পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ হয় এবং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) স্বয়ং প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র নির্দে শ অনুযায়ী তিনি উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য তা'লীমুল ইসলাম কলেজ, লাহোরে ভর্তি হন যেখান থেকে তিনি পরিসংখ্যানে বি.এসসি এবং এরপর এম.এসসি ডিগ্রী অর্জন করেন।১৯৫৩ সনে দপ্তরে তার প্রথম নিযুক্তি হয় আর এরপর তিনি বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করতে থাকেন। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ সন পর্যন্ত সিয়েরালিওনে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮৩ সনে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) উকিলুয্ যিরাআত এবং সানাআত ও তিজারাত মনোনীত করেন। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৯ পর্য ন্ত উকিলুদ্ দিওয়ান এবং ১৯৯৯ থেকে ২০১২ সন পর্য ন্ত উকিলুয্ যিরাআত এবং সানাআত ও তিজারাত পদে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন; ২০১২ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি উকিলুয্ যিরাআত ছিলেন। তার দায়িত্ব পালনের সময়কাল ৬৯ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়াও তিনি আঞ্জুমান ও তাহরীক জাদীদের অনেকগুলো কমিটির সদস্য ছিলেন এবং কয়েকটি নিবন্ধিত কোম্পানীর পরিচালকও ছিলেন। অনুরূপভাবে খোদ্দামুল আহমদীয়াতেও মোহতামীম হিসেবে বিভিন্ন বিভাগে সুদীর্ঘকাল কাজ করার সুযোগ পান।

তার সহধর্মিণী আমাতুল হাফীয সিয়াল সাহেবা বলেন, ৬৪ বছরের বৈবাহিক জীবনে আমি দেখেছি, তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান, সহমর্মী, আল্লাহ্র প্রতি আস্থাশীল এবং আদর ও স্নেহশীল একজন মানুষ ছিলেন। তিনি প্রতিটি কাজে নিজের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দিতেন এবং যুগ খলীফার নির্দেশাবলীকে সকল বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দিতেন। তিনি বলেন, বিয়েরপর শুরুতেই তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আমি একজন ওয়াকেফে যিন্দেগী আর একজন ওয়াকেফে যিন্দেগীর স্ত্রীও ওয়াকেফে যিন্দেগী হয়ে থাকে। তিনি আরো বলেন, তিনি দরিদ্রদের আশ্রয়স্থল ছিলেন আর আমাদের বাড়িতে অনেক বেশি আতিথেয়তা করা হতো।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

তার ছেলে ইফতেখার উল্লাহ্ সিয়াল সাহেব বলেন, শৈশব থেকেই তার মাঝে জামা'তের প্রতি অনেক বেশি বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসা ছিল। ১৯৪৭ সনের বিশৃঙ্খলার সময় তার পিতা শহীদ হলে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে যান; আর যেভাবে বলা হয়েছে যে, আত্মীয়স্বজনের মাঝে তার পিতাই কেবল আহমদী ছিলেন আর তার মাও (তাদেরকে) ছেড়েচলে গিয়েছিল। তখন আত্মীয়স্বজনরা তঁাকে বলে, 'তুমি আহমদীয়াত ছেড়ে দাও, তাহলে আমরা তোমার সমস্ত জাগতিক ও পড়াশোনার ব্যয়ভার বহন করব।' কিন্তু আহমদীয়াতের প্রতি ভালোবাসা এবং আহমদীয়াতের সত্যতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকার কারণে তিনি (তাদেরকে) উত্তর দেন, 'ক্ষুধার্ত অবস্থায় মরলেও আমি আহমদীয়াত ছাড়ব না'; আর পরে সর্বদাই এই ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। জীবন উৎসর্গের ধারাবাহিকতা যেন তার বংশধরের মাঝেও চলমান থাকে– এ বিষয়ের তার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি বলেন, তাই আমি যখন ওয়াক্ফ করি তখন তিনি খুবই আনন্দিত হন। যখন এখানে বা লন্ডনে আসেন, তখন তিনি নিজে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে (এ সংবাদ) দেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, 'এটিই আসল ওয়াকফ'; অর্থাৎ এই ধারা যেন পরবর্তিতে সন্তানসন্ততির মাঝেও চালু থাকে। জাগতিক বা ধর্মীয় সমস্যার সম্মুখীন হলে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হতেন এবং সেই কঠিন সমস্যার সমাধানের জন্য অত্যন্ত কাকুতিমিনতি করে দোয়া করতেন।

তার আরেক পুত্র লিখেন, আমি সারা জীবনে একবারও তাকে তাহাজ্জুদ নামায কামাই দিতে দেখি নি। দরিদ্রদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। তিনি বলেন, তার মৃত্যুর পর অনেক লোক এসে আমাকে বিশেষ করে বলেছে, যখনই আমাদের কোনো অর্থের প্রয়োজন পড়তো আমরা তৎক্ষণাৎ সিয়াল সাহেবের কাছে যেতাম, আর তিনি আমাদের সব সময় সাহায্য করতেন। কোন সময় বাড়িতে কোনো সমস্যা দেখা দিলে আর সেই একই সময়ে জামা'তের অন্য কোনো দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন দেখা দিলেতিনি জামা'তের কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেতেন আর বাড়ির সমস্যাকে আল্লাহ্র হাতে ছেড়ে দিতেন।

তার পুত্রবধু বলেন, সব সময়ই তিনি আমাকে জামা'তের প্রতি ভালোবাসা এবং খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার পাঠ দিতেন। যুগ খলীফার মুখনিঃসৃত প্রতিটি শব্দের প্রতি তার সর্বোচ্চ বিশ্বাস ছিল। এ সম্পর্কে তিনি বলতেন, শুরুতে যখন ওয়াক্ ফের ব্যাপারে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র সমীপে উপস্থিত হন তখন চার্চিল ৮০ বছর বয়সে সবেমাত্র দ্বিতীয়বার প্রধান মন্ত্রী হয়েছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে বলেন, 'চার্চিল যদি ৮০ বছর বয়সে প্রধানমন্ত্রী হতে পারে তাহলে তোমরা কেন এ বয়স পর্যন্ত জামা'তের সেবা করতে পারবে না?' তিনি বলেন, 'তখনই আমি একথার যে ফলাফল নির্ণয় করেছিলাম তা হলো- এই গ্রুপে আমরা যে কয়জনই ওয়াকেফে যিন্দেগী রয়েছি, আমাদের বয়স কমপক্ষে ৮০ বছর অবশ্যই হবে, আর আল্লাহ্ তা'লা ৮০ বছর পর্য ন্ত দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য দান করবেন।' বস্তুতঃ চৌধুরী হামীদুল্লাহ্ সাহেব, মুসলেহ্ উদ্দীন সাহেব উনার সঙ্গী ছিলেন, তারা সবাই ৮০ বছরের অধিক আয়ু পেয়েছেন– এটি তার পুত্রের বর্ণনা।

তার পুত্রবধু বলেন, শৈশবেই আমার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। শ্বশুররূপে আমি তার কাছ থেকে পিতৃস্নেহ লাভ করেছি। ২২ বছরের বৈবাহিক জীবনে সর্বদাই আমি তার কাছ থেকে স্নেহ ও পিতার ভালোবাসাই পেয়েছি। আহমদীয়াতের খাঁটি প্রেমিক এবং খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণকারী, দরিদ্র দের প্র তিপালনকারী, অতিথিপরায়ণ খাঁটি একজন মানুষ ছিলেন। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করতেন। ছোট ছোট বিষয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। আমার সন্তানদের তরবিয়তেও তিনি বড় ভূমিকা রেখেছেন। তাদেরকে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ শিখতে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি পাঠের প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন, আবার পরীক্ষাও নিতেন। তিনি বলেন, বাচ্চারা যখনই দাদার সাথে বসতো সব সময় তিনি (তাদের কাছে) জামা'তের ইতিহাস এবং খলীফাদের অনুগ্রহ ও ভালোবাসার ঘটনাবলী বর্ণনা করতেন। যত ছোট বাচ্চাই ঘরে আসুক না কেন,তাকেও আদর-আপ্যায়ন ছাড়া ঘর থেকে যেতে দিতেন না।

যুগ খলীফার বাণী

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

নায়েব উকিলুয্ যিরাআত বাসেল সাহেব লিখেন, সামীউল্লাহ্ সিয়াল সাহেব অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন, খিলাফতের প্র তি অগাধ ভালোবাসা ছিল। দপ্তরের কর্মচারীদেরও তিনি আর্থি কভাবে সাহায্য করতেন। সবর্দা যুগ খলীফার সাথে যোগাযোগ বজায় রাখার উপদেশ দিতেন। তিনি বলেন, সর্বদা তিনি এ শিক্ষাই দিতেন যে, জামা'তের এক একটি পয়সারও সুরক্ষা করতে হবে। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এ চিন্তা নেই যে অর্থ কোথা থেকে আসবে; বরং আসল চিন্তার বিষয় হলো- অর্থ তত্ত্বাবধানকারী কোথা থেকে আসবে অথবা পাওয়া যাবে।

তিনি আরো বলেন, যখনই কোনো ওয়াকেফে যিন্দেগী বা কর্মকর্তা অথবা কোনো আহমদী সাক্ষাতের জন্য আসতো তাকে তিনি বলতেন, জামা'তের সেবা করার মাঝে অনেক বরকত রয়েছে, এবং যে সেবা করে তার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা সীমাহীন অনুগ্রহ করেন আর আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তার চাহিদা পূর্ণ করতে থাকেন। নিজের উদাহরণ দিয়ে বলতেন, আমি কিছুই ছিলাম না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অনেক দিয়েছেন আর এটি শুধু ওয়াকফের কল্যাণেই (লাভ হয়েছে)।

নাসরীন হাই সাহেবা বলেন, আমাদের পরিবারের গুরুত্ব পূর্ণ সদস্য ছিলেন। আমার পিতামাতা সর্বদাই তাকে অনেক সম্মান করতেন। তার কোন কন্যা ছিল না। আমার বয়স যখন ৭/৮ বছর হয় তখন তিনি এবং ফুফু আমাকে পালক নেন। এরপর থেকে আমার বিয়ে পর্যন্ত আমি তাদের সাথেই থাকি। তারা উভয়েই সর্বদা আমাকে আপন মেয়ের মত লালনপালন করেছেন এবং শৈশব থেকে আমার সকল ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন। সর্বোত্তম শিক্ষা দিয়েছেন এবং মুরব্বীর সাথে আমার বিয়ে দিয়েছেন।

ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারী মাহমুদ তাহের সাহেব বলেন, একবার তিনি বলেন, আমি বি.এ পাশ করার পর আমার প্রাথমিক পদায়ন হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র নির্দেশে আমাকে এম.এ করতে পাঠানোর জন্য প্রস্তুতি চলছিল। ওই সময় দপ্তরে কেউ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র কাছে এই শঙ্কা ব্যক্ত করে বলে যে, 'আপনি তাকে এম.এ করাচ্ছেন; এম.এ পাশ করার পর সে না আবার অন্য কোথাও চলে যায়!' অর্থাৎ সে না আবার জাগতিক কোনো চাকুরিতে যোগ দিয়ে বসে। একথা শুনে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, 'সিয়াল কখনো বিশ্বাসঘাতক হয় না।

তাহরীকে জাদীদের জায়েদাদ বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ওয়াকফে যিন্দেগী ইমরান বাবর সাহেব বলেন, তার সাথে আমার ১৫ বছরের অধিক কাল কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তিনি খুবই দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন। জামা'তের কাজে কখনো কোনো সরকারি কর্ম কর্তার সাথে সাক্ষাৎ করতে বা (তাদের সাথে) আলাপ আলোচনা করতে সংকোচ করতেন না। ট্রেনে সফর করার সুযোগ হলে সফরকালে অবশ্যই তবলীগ করতেন এবং উঁচু স্ব রেই করতেন যেন কাছাকাছি অবস্থানকারী সবাই তা শুনতে পায়।

উকিলুল মাল-১ লোকমান সাহেব বলেন, খিলাফতের আহ্বানে নিজেও সাড়া দিতেন এবং অন্যদেরও এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। সব সময়ই যখন তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা হতো তৎক্ষণাৎ আসতেন এবং চাঁদা ইত্যাদি আদায় করতেন বা ওয়াদা লিখাতেন।তাহরীকে জাদীদ দপ্তরের শেখ হারেস সাহেব বলেন, আমি যখন ওয়াকফ করি, তখন তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাকে দিকনির্দে শনা দিয়েছেন। খুবই ভালোবাসা ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতেন। অত্যন্ত নির্ভি ক ও সাহসী ওয়াকেফে যিন্দেগী ছিলেন। জামা'তের সম্পদ সাশ্রয়ের ব্যাপারে পারদশী ছিলেন। হারেস সাহেব আরো লেখেন, ২০১৫ সালে পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার জাভেদ সাহেব বিশেষ সফরে ইসলামাবাদ থেকে রাবওয়া আসেন। অন্যান্য বুযুর্গরা ছাড়াও সিয়াল সাহেবের সাথে তার সাক্ষাৎ করানো হয়। এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতেও তিনি তবলীগের সুযোগ হাতছাড়া হতে দেন নি এবং তাকে খুব সুন্দরভাবে তবলীগ করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন, তার যে ওয়াকেফে যিন্দেগী পুত্র রয়েছেন তাকেও ওয়াকফের দায়িত্ব উত্তমরূপে পালনের সৌভাগ্য দিন এবং তার বংশধরদের খিলাফত ও জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন আর তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে প্রশান্তি দিন।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

পরবর্তী জানাযা মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ মরহুম আলী আহমদ সাহেবের সহধর্মিনী শ্রদ্ধেয়া সিদ্দীকা বেগম সাহেবার। সম্প্রতি তিনি ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ***ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।*** তার পুত্র আব্দুল হাদী তারেক সাহেব একজন মুরব্বী সিলসিলা এবং (বর্তমানে) জামেয়া আহমদীয়া ঘানায় শিক্ষকতা করছেন। কাদিয়ানের কাছাকাছি তার জন্ম হয়েছিল। তার পিতা আব্দুর রহমান সাহেব ১৯৪৪ সালে যৌবনেই মৃত্যুবরণ করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার বিধবা মা নওয়াব বিবি সাহেবা ও তার সন্তানদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন; তিনি তাদেরকে কাদিয়ান ডেকে পাঠান এবং নওয়াব আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবা (রা.) তাদেরকে নিজ বাংলোয় রাখেন। মুরব্বী সাহেব বলেন, অধমের নানি হযরত নওয়াব আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবার সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দেশবিভাগের পর আমার নানিকে নিজ সন্তানদের সাথে সিন্ধু র নাসেরাবাদ পাঠিয়ে দেন; সেখানে তারা বড় হন।তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিয়াঁ আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব (রা.)'র পুত্রবধূ ছিলেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এক সাহাবীর পুত্রবধূ ছিলেন, একজন ওয়াকেফে যিন্দেগীর সহধর্মিনী ছিলেন এবং একজন ওয়াকেফে যিন্দেগীর মা ছিলেন। তিনি নিজের ওয়াকেফে যিন্দেগী স্বামীর সাথে ওয়াকফের পূর্ণ চেতনা নিয়ে ওয়াকেফে যিন্দেগীর মতই জীবন কাটিয়েছেন এবং সকল প্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজের ওয়াকেফে যিন্দেগী স্বামীর সঙ্গ দিয়েছেন। সারাজীবনে কখনো কারো কাছে কিছু চান নি বা দাবি করেন নি। অজস্র গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। এগুলোর মাঝে বিনয়, খোদাভীরুতা, দরবেশী , আতিথেয়তা, নম্রতা, সরলতা, স্বল্পে-তুষ্টি, শালীনতা, ধৈর্য, অদম্য মনোবল বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সারাজীবনে কখনো কারো ব্যাপারে অভিযোগ ও অনুযোগ করেন নি, কিংবা কখনো কারো বদনাম শুনেনও নি বা বদনাম করেনও নি। আপন-পর সবার সাথে সব সময় ভালোবাসা ও নিষ্ঠাপূর্ণ আচরণ করতেন। পাঁচবেলার নামায ছাড়াও নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত ছিলেন। তেমনিভাবে নিয়মিত কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন এবং শেষ বয়সে অসুস্থতার মাঝেও যখন ঠিকভাবে নামায পড়তে পারতেন না, তখন এই দোয়া করতেন- 'হে প্রভু! এতটা সুস্থতা ও মনোবল দান কর যেন তোমার ইবাদত ঠিকভাবে করতে পারি।'

তার অবর্তমানে তিনি দুই মেয়ে ও তিন ছেলে রেখে গেছেন। যেভাবে আমি বলেছি, তার এক পুত্র আব্দুল হাদী তারেক সাহেব ঘানায় জামাতের মুরব্বী আর সেখানে কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে নিজ মায়ের জানাযায় অংশ নিতে পারেন নি।

আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্য ও মনোবল দান করুন, তাদেরকে তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার সামর্থ্য দিন এবং মরহুমার প্রতি দয়া ও ক্ষমাপূর্ণ ব্যবহার করুন, আর তার পদমর্যাদা উন্নত করুন।

****

২য় পাতার পর...

অহংহার করা। কখনও সে সম্পদ নিয়ে গর্ব করে, কখনও বংশ নিয়ে বড়াই করে, কখনও ভাল গাড়ি নিয়ে অহংকার করে বলে যে অমুক নামি মডেল বা দামি গাড়ি ক্রয় করেছে। কখনও বড় বাড়ি নিয়ে গর্ব করে। যেমনটি আমি বলেছি, এমনকি অনেকে নিজেদের ফ্যাশন সচেতনতা নিয়েও অহংকার করে। আর তারা এমন পর্যায় ফ্যাশন করে যে, ফ্যাশনের নামে নামমাত্র পোশাক পরে আর তাতে লজ্জাশীলতা মুছে গেলেও তারা গর্ব করে। এতে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই রয়েছে। পুরুষরা দাবি, তাদের স্ত্রী ফ্যাশনেবল হওয়া উচিত, তার মধ্যে লজ্জাশীলতা থাকুক বা না থাকুক।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মানবতার সম্পর্ক বজায় রাখতে যখন নিজের সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য একজন মোমেনকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে উন্নত পোশাক তৈরী কর। অপরদিকে গরীবদের গায়ে পোশাক দিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টির উপকরণও তৈরী কর। কেননা, গরীবদের সৌন্দর্য তো সাধারণ পোশাকেও হয়ে যায়। কেননা সেই পোশাকেই সম্মান রক্ষা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: একজন মোমেনা মহিলাকে আল্লাহ্ তা'লা সাধারণত সৌন্দর্য রক্ষা এবং তা গোপন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, তবে সেই সৌন্দর্য ছাড়া যা নিজে থেকে প্রকাশ পায়। এখানে নিজে থেকে প্রকাশ পাওয়া সৌন্দর্য বলতে দেহের বাহ্যিক গঠন এবং হাত-পা ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। দেহের গঠন বা এই ধরণের জিনিস এমন সৌন্দর্য যা গোপন থাকে না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এ প্রসঙ্গে পর্দার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন: সৌন্দর্য প্রকাশ এবং পর্দা ত্যাগ করানো পিছনে পুরুষদেরও হাত রয়েছে। যখন তারা সমাজের প্রভাবে নিজেদের স্ত্রীকে বুরকা এবং নিকাব খুলে ফেলতে বলে। এখানে জার্মানীতেও অনেকে আছেন আর কিছু অন্য দেশেও আছেন। কিন্তু কিছু কিছু দেশের মহিলারা তাদের স্বামীর নামে এই অভিযোগ আমাকে লিখে পাঠায় যে তাদের স্বামীরা তাদেরকে এভাবে বাধ্য করছে। অতএব, এমন পুরুষদেরও নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করা দরকার আর মহিলাদেরও স্বামীর এমন সব কথা অমান্য করা উচিত যা শরিয়তের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজও যে সব আহমদী মহিলা ও পুরুষেরা নিজেদের সম্পদে বরকতের জন্য দোয়া করায় আর চেষ্টাও করে, এমনটি তারা এজন্য করে না যে সম্পদ বৃদ্ধি তাদের জাগতিক মহত্বের কারণ হবে, বরং তাদের উদ্দেশ্য থাকে জামাতের জন্য খরচ করা, আল্লাহ্‌র পথে কুরবানীতে খরচ করা, মসজিদ তৈরীতে খরচ করা, মানবতার সেবায় খরচ করা এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা । কিন্তু কিছু কিছু মানুষ আছেন যারা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকা সত্ত্বেও চাঁদা দানের ক্ষেত্রে কৃপণতা করে। তারা সম্পদ অর্জন করার প্রতিযোগিতা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে না, বরং জগতের জন্য করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়া মানুষের জন্য পুরস্কার হিসেবে রয়েছে তার সন্তান-সন্ততি। সন্তান থেকে বঞ্চিত লোকেরা সন্তান লাভের জন্য দোয়াও করায় আর নিজেরাও দোয়া করে, চিকিৎসাও করায়। চিকিৎসার খরচের জন্যও তারা কোনও রকম পরোয়া করে না। কিন্তু সন্তান যখন খোদা ও তাঁর ধর্মের মোকাবেলায় এসে পড়ে, সন্তান তখন পুরস্কার না হয়ে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, আল্লাহ্ তা'লার বিরাগভাজন হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে সন্তানের জন্মের পূর্বে এবং পরেও সব সময় পুণ্যবান সন্তান লাভের দোয়া করতে থাকা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই জগতের বাহ্যিক উপকরণসমূহ, এই জগতের সৌন্দর্য, জাগতিক সম্পদ ও সম্মান যা তোমরা এই পৃথিবীতে অর্জন কর, তোমাদের সন্তানসমূহ যা তোমাদের বংশবৃদ্ধির কারণ হয়- এগুলির প্রত্যেকের দুটি দিক রয়েছে। যদি জাগতিক উদ্দেশ্য থাকে আর খোদা তা'লাকে ভুলে যাওয়া হয় তবে এর উপমা সেই শস্য ক্ষেতের ন্যায় যা মানুষকে ক্ষণিকের আনন্দ দেয় আর শেষে সেগুলি খড়কুটোর ন্যায় বাতাসে উড়ে যায়। হাতে কিছুই আসে না। আর মানুষ খোদা তা'লার শাস্তির কবলে পড়ে। কিন্তু এই সব জাগতিক উপকরণসমূহকে যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে নেন, তবে এই জাগতিক প্রতিযোগিতা না থেকে আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমা লাভের প্রতিযোগিতায় পরিণত হয় যার পরিণামে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে আকাশ ও পৃথিবী ব্যপৃত তাঁর কৃপারাজি দান করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) কতিপয় উদ্ধৃতি সহকারে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: হে আহমদী মহিলা ও বালিকাগণ! যারা এই যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিজেকে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার অঙ্গীকার করেছ, যারা নিজেদেরকে জাগতিক ক্রীড়াকৌতুক থেকে দূরে থাকার ঘোষণা করেছ, যারা নিজেদের মান-সম্মানকে রক্ষা করছ, যারা নিজেদের সম্পদকে আনন্দ উপভোগে না লাগিয়ে ধর্মের প্রসারের কাজে ব্যয় করার অঙ্গীকার করেছে, যারা নিজেদের সন্তানকে ধর্মের সেবার জন্য উৎসর্গ করার অঙ্গীকার করেছ- আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা আত্মসমীক্ষা করে দেখুন যে, আপনারা কোন সীমা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার অপ্রীতিভাজন হওয়া থেকে রক্ষা পেয়ে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করছেন? নিজেদেরকে কতটা তাঁর ক্ষমালাভ এবং সন্তুষ্টির চাদরে আবৃত করছেন? কতটা নিজেদেরকে জাগতিকতার প্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা করছেন, কতটা নিজেদের অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারছেন। কতটা আল্লাহ্ তা'লার অসীম রহমতের ব্যাপ্তির সন্ধানে সচেষ্ট আছেন আর একজন প্রকৃত মোমেন হয়ে আল্লাহ্ তা'লার কৃপার উত্তরাধিকারী হচ্ছেন? কতটা নিজেদের স্বামীর ধর্মীয় ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন যাতে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা লাভের মধ্য দিয়ে চিরকাল তাঁর কৃপার উত্তরাধিকারী হতে পারেন? আল্লাহ্ করুন প্রত্যেক আহমদী মহিলা এবং পুরুষ আল্লাহ্ তা'লার কৃপা, ক্ষমালাভ এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পূর্বের চাইতে বেশি সচেষ্ট হোক। আমীন।

****

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

১ম পাতার পর...

জুমআর খুতবা

‘আমার জামা’তের (সদস্যদের) জন্য বিশেষভাবে তাকওয়া অর্জনকরা আবশ্যক। কেননা তারা এমন একজন ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ যিনি প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবিকরেছেন; যেন সেসব লোক যারা কোন ধরনের হিংসা, বিদ্বেষ বা অংশীবাদিতায় লিপ্ত অথবা তারাযত জগৎমুখীই থাকুক না কেন, (তারা) যেন সেই সমস্ত বিপদাপদ থেকে মুক্তি পায়।’ [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)]

আজ থেকে একশ’ কুড়ি বছর পূর্বে যে মিথ্যা দাবিকারক ও ইসলামের শত্রুর ধ্বংস হবার ভবিষ্যদ্বাণী তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা’লার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে করেছিলেন, আজ তার শহরেই আল্লাহ্ তা’লা জামা’তকে মসজিদ বানানোর সৌভাগ্য দান করেছেন, যার সম্পর্কে সে ঘোষণা করেছিল যে, কোনো মুসলমান খ্রিষ্টান না হওয়া পর্যন্ত তাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

মহান মির্যা গোলাম আহমদ যিনি মসীহ, যিনি ডুইয়ের ভয়ানক পরিণতির সংবাদ দিয়েছিলেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে নিরন্তর তবলীগ ও দোয়ার মাধ্যমে চিরস্থায়ী করে তোলা আবশ্যক।

আমাদেরকে মুসলমানদেরকেও এক ও অভিন্ন ধর্মে একত্রিত করে তাদের মাঝ থেকে সমস্ত বিদাত দূরীভূত করতে হবে, আর অমুসলিমদেরকেও ইসলামের অনিন্দ্য–সুন্দর শিক্ষার সাথে পরিচিত করে তাদের এক–অদ্বিতীয় খোদার ইবাদতকারী এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রতি দরূদ প্রেরণকারী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

অতএব আজকে এই মসজিদের উদ্বোধন তখন মহান (সাব্যস্ত) হবে যদি আমরা এই প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে সক্ষম হই যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী?

আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মসজিদগুলোকে আবাদ করা (বা নামাযী দিয়ে ভরে তোলা) এবং আল্লাহ্ তা’লার বিধি–নিষেধ পালন করার মাধ্যমে আবাদ করা, আর আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা, আর (এমনটিই) হওয়া উচিত।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের জাইয়ন স্থিত ফতহে আযীম মসজিদে প্রদত্ত ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (৩০ তাবুক, ১৪০১ হিজরী শমসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা’উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ আপনারা এখানে যায়নের মসজিদ উদ্বোধনের জন্য সমবেত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা’লা আমেরিকা জামা’তকে এই মসজিদ নির্মাণের তৌফিক প্রদান করেছেন, আর সেই শহরে (নির্মাণের) তৌফিক দিয়েছেন যা জামা’তের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্ব রাখে। দুদিন পূর্বে একজন সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করেছে যে, এই জায়গার জন্য এ মসজিদটি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? সব মসজিদই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। আমি তাকে এটিই বলেছিলাম যে, সব মসজিদই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সে ধরে নিয়েছে, এই মসজিদের জন্য আমি (হয়তো) বিশেষভাবে এখানে এসেছি। আমি বললাম, পূর্বেও আমি বিভিন্ন মসিজদ উদ্বোধনের জন্য যেতাম। যাহোক, তাকে আমি বলেছি যে, এই মসজিদের একটি (বিশেষ) গুরুত্বও রয়েছে। আর তা হলো, যে শহরে এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছে তা এক ইসলাম–বিদ্বেষীর বানানো শহর। আর যারা ইতিহাস জানতে আগ্রহ রাখে তারা এই ইতিহাস জানার চেষ্টা করবে। যেহেতু জামা’ত ছাড়া এই শহরের ইতিহাস কেউ জানে না আর ডুইকেও (হয়তো) চেনে না, তাই এর ইতিহাস তুলে ধরার জন্য একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও জামা’তের পক্ষ থেকে করা হয়েছে, যার মাধ্যমে এই ইতিহাসের ওপর আলোকপাত হয়। জামা’তের কাছে এটিই এ শহরের গুরুত্ব। আর যাদের আগ্রহ আছে তারা এই প্রদর্শনী থেকে কিছুটা উপকৃতও হতে পারে। সে হয়ত আগামীকাল এ সম্পর্কে প্রবন্ধও লিখবে। যাহোক, আমি যেমনটি বলেছি, এই শহরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব, অমূলক দাবি নিয়ে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর বিরুদ্ধে তার অশালীন ভাষা ব্যবহার করা, এরপর তার ধ্বংস হওয়া এবং এই শহরে জামা’তের প্রতিষ্ঠা– প্রত্যেক আহমদীকে আল্লাহ্ তা’লার প্রতি কৃতজ্ঞতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে, আর করা উচিতও। আর এর জন্য মহানবী (সা.)–এর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা এই শহরের অধিবাসীদেরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যারা শুরুতে মসজিদ নির্মাণে কাউন্সিলের বিরোধিতা সত্ত্বেও, মসজিদ নির্মাণের অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো সত্ত্বেও আমাদের পক্ষে দাঁড়ায় আর কাউন্সিলকে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি প্রদানে বাধ্য করে।

অতএব মহানবী (সা.)–এর উক্তি হলো, যে মানুষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকরে না সে খোদা তা’লার প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।

(সুনান আততিরমিযী, আবুওয়াবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, হাদীস–১৯৫৪)

অতএব এই নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের সেই মহান খোদার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যিনি আমাদেরকে এই মসজিদটি নির্মাণের তৌফিক দিয়েছেন। এদিক থেকে আহমদীদের জন্য (এটি) কেবল একটি আনন্দের দিন নয়, বরং পরম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনেরও দিন। অর্থাৎ সেই খোদার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দিন যিনি আমাদেরকে মসজিদ নির্মাণের পাশাপাশি যুগের ইমাম ও মহানবী (সা.)–এর প্রকৃত প্রেমিকের সত্যতার জীবন্ত নিদর্শনও দেখিয়েছেন।

ইতিহাসের পাতা থেকেও, অর্থাৎ সে যুগের ইতিহাস থেকেও কিছু কথা আমি বর্ণনা করব যার মাধ্যমে এর গুরুত্ব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর সত্যতা এবং মানুষের তা স্বীকার করার কথা জানা যায়। আমরা যত বেশি কৃতজ্ঞ হব তত বেশি খোদা তা’লা আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহরাজিতে ধন্য করবেন, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর সত্যতার নিদর্শন আমাদের সামনে উন্মোচিত হতে থাকবে।

সুতরাং আমাদের এই কৃতজ্ঞ অবস্থাই আমাদেরকে সেসব নিদর্শনের সত্যতার সাক্ষী বানাবে। নিঃসন্দেহে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর সাথে আল্লাহ্ তা’লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে; জামাতের উন্নতি সংক্রান্ত অগণিত প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আল্লাহ্ তা’লা তাঁকে (আ.) জামা’তের উন্নতি দেখাবেন; দেখিয়েছেন, দেখাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও দেখাতে থাকবেন। কিন্তু আমরা সেসব উন্নতি দেখার ও সেগুলোর অংশ হওয়ার উপযুক্ত তখন হব, যখন আমরা আল্লাহ্ তা’লার প্রতি কৃতজ্ঞ হব এবং আল্লাহ্ তা’লার নির্দেশাবলী পালনকারী হব ও তাঁর প্রাপ্য প্রদানকারী হব।

বহু প্রতিশ্রুতি রয়েছে যেগুলো আমরা নিজেদের জীবদ্দশায় পূর্ণ হতে দেখেছি। আল্লাহ্ তা’লা যথাসময়ে প্রত্যেক প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা দেখিয়ে থাকেন। এটি প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা নয় তো আর কী যে, আজ থেকে একশ’ কুড়ি বছর পূর্বে যে মিথ্যা দাবিকারক ও ইসলামের শত্রুর ধ্বংস হবার ভবিষ্যদ্বাণী তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা’লার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে করেছিলেন, আজ তার শহরেই আল্লাহ্ তা’লা জামা’তকে মসজিদ

বানানোর সৌভাগ্য দান করেছেন, যার সম্পর্কে সে ঘোষণা করেছিল যে, কোনো মুসলমান খ্রিষ্টান না হওয়া পর্যন্ত তাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

সুতরাং এটা আল্লাহ্ তা'লার কাজ! একজন কোটিপতি ও পার্থিব সম্মান-প্রতিপত্তির অধিকারীকে আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন, নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন; আর পাঞ্জাবের ছোট্ট একটি গ্রামের অধিবাসী তাঁর প্রেরিত ব্যক্তির দাবি, যা ইসলামের পুনর্জাগরণের বিষয়ে করা হয়েছিল, তা পৃথিবীর দুইশ' কুড়িটি দেশে অনুরণিত হবার উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। কিন্তু এখানেই কি আমাদের কাজ শেষ হয়ে যায়? এটিই কি যথেষ্ট যে, আমরা আমেরিকার ছোট একটি শহরে মসজিদ বানিয়ে ফেলেছি,আর তাতেই জামা'তের উন্নতি হয়ে গেছে? না।

আল্লাহ্ তা'লা তো সমগ্র পৃথিবীকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য কর্মক্ষেত্র বানিয়েছেন। আমাদেরকে তো ছোট-বড় সব শহর ও দেশকে মহানবী (সা.)-এর দাসত্বের গণ্ডিভুক্ত করতে হবে।আমরা যদি নিজেদের উপায়-উপকরণের দিকে তাকাই তাহলে এটি অনেক বড় কাজ বলে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এতদসত্ত্বেও এই কাজ আমাদের স্কন্ধে অর্পণ করেছেন এবং এটিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু তিনি (আ.) বলেছেন, এই যাবতীয় কর্ম যা সম্পাদিত হচ্ছে, তা তো আমাদের যৎসামান্য প্রচেষ্টা মাত্র, প্রকৃতপক্ষে এর পাশাপাশি দোয়া করা আবশ্যক; এই কাজ দোয়ার মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

তাই এই গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদের সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা প্রয়োজন যে, দোয়ার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। আর মসজিদ নির্মাণও এজন্যই করা হয়ে থাকে যেন মানুষ তাতে ইবাদতের লক্ষ্যে একত্রিত হয়, পাঁচবেলা আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থিত হয়, জুমআর নামাযে নিয়মিত আসে, জাগতিক আমোদ-প্রমোদ ও কর্মব্যস্ততায় নিজেদের ইবাদতের কথা যেন ভুলে না যায়। যদি আমরা আমাদের ইবাদতের কথা ভুলে যাই, তবে এই মসজিদ বানানো কেবলমাত্র এক বাহ্যিক কাঠামো দাঁড় করানো বৈ কিছু নয়। একদিকে আমরা জগদ্বাসীকে একথা বলছি বলে প্রতিভাত হবে যে, 'এখানে মুসলমানদের একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে', কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে আমরা এই মসজিদের আশিসরাজি দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে বসব। তিনি (আ.) যা বলেছেন তাহলো, 'নিরন্তর দোয়ার মাধ্যমে আমার সাহায্যকারী হও যেন আমরা দ্রুততম সময়ে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি প্রকাশ পেতেদেখি।'

তাই আজ আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হলো, নিজেদের দোয়াসমূহকে গ্রহণযোগ্য বানানোর জন্য ইবাদতকে নিজেদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করা, নিজেদের সন্তানসন্ততির মাঝেও ইবাদতের অভ্যাস গড়ে তোলা, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত পন্থা অনুসারে নিজেদের নামায যত্নসহকারে আদায় করা; নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'লার সামনে প্রণত হওয়া এবং তাঁর কাছে আরও অধিক বিজয় যাচনা করা। আমাদের মধ্যে যারা এই সবকিছু অর্জন করতে সক্ষম হবে ও আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিও বর্ষিত হতে দেখবে- তারা কতই না সৌভাগ্যবান!

যদি আমরা নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করি, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিই, তবে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেগুলো নিজেদের জীবদ্দশায় পূর্ণ হতে দেখব।

সুতরাং আমাদের নিজেদের অবস্থার প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। উন্নত দেশসমূহে এসে জাগতিকতায় হারিয়ে যাবেন না; বিগত কিছু সময় ধরে নতুন অভিবাসন প্রত্যাশীরাও এখানে এসেছেন; তাই জাগতিকতায় ডুবে যাবেন না। এখানে নির্মিত প্রতিটি মসজিদ যেন আমাদের মাঝে এক নব প্রেরণা ও উদ্দীপনা এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির কারণ হয়।আল্লাহ্ তা'লা আপন প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ করবেন। এমন যেন না হয় আমাদের কৃতকর্মের দরুন সেসব প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা বিলম্বিত হয়ে যায়, বা তা আমাদের পরে আগমনকারী অন্য কারো মাধ্যমে পূর্ণ হয় আর আমরা বঞ্চিত রয়ে যাই। মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর মহানবী (সা.)-এর চেয়ে প্রিয় নবী আর কে ছিলেন বা হতে পারেন? কিন্তু তা সত্ত্বেও বদরের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-এর আহাজারি, বিনয়, ভীতি ও ভয় এবং দোয়া কি এক মহান মার্গে উপনীত ছিল না? তিনি এত আহাজারি করছিলেন যে, বারবার তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে যাচ্ছিল।এরপর যখন হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! যেখানে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সেখানে আপনি এত অস্থিরতা কেন প্রদর্শন করছেন?' এর উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, 'আল্লাহ্তা'লা অমুখাপেক্ষী। বিজয়ের প্রতিশ্রুতিতে অনেক সুপ্ত শর্ত থাকে; তাই আমার কাজ হলো, একান্ত কাকুতি মিনতির সাথে আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাঁর সাহায্য যাচনা করা।' (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১)

এরপর বিভিন্ন সময়ে শত্রুদের উপর্যুপরি আক্রমণ এবং সকল অর্থে ক্ষতির করা সত্ত্বেও কয়েক বছর পরই আল্লাহ্ তা'লা যে মহা বিজয় দান করেছেন, সে ধরনের মহা বিজয় ইতিহাস কখনো দেখে নি আর শোনেও নি। এতে প্রাণের শত্রুরা কেবল মুসলমানই হয় নি বরং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে, নিজ প্রাণ মহানবী (সা.)-এর জন্য বিসর্জন দেওয়ার বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জগদ্বাসীর সামনে তারা এটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কোন শত্রু আমাদের লাশ অতিক্রম না করে মহানবী (সা.) পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। আর যাদের নিয়তিতে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা লেখা ছিল, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ধ্বংস করে দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, সেই 'ফানি ফিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ্র সত্তায় বিলিন নবীর দোয়াসমূহই ছিল যা এই বিপ্লব সাধন করেছে।

(বারকাতুদ দোয়া, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১১)

অতএব, আজও আল্লাহ্র সত্তায় বিলীন নবীর সত্যিকার দাসের দোয়াই যথাসময়ে পূর্ণ হয়ে বিশ্ববাসীকে মহানবী (সা.)-এর পদতলে নিয়ে আসবে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তোমরা যারা নিজেদেরকে আমার প্রতি আরোপ করছো, তোমরা নিজেদের দোয়া ও কর্ম দিয়ে আমাকে সাহায্য কর।

আজ আমরা এই মসজিদে বসে আছি, এর উদ্বোধন করছি আর এরনামও রেখেছি 'ফাতহে আযীম মসজিদ'। এই নাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহাম ও ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে রাখা হয়েছে। তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অবগত হয়ে ডুই-এর ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আর তিনি বলেছিলেন, এই নিদর্শন অচিরেই প্রকাশিত হবে যা মহা বিজয় নিয়ে আসবে। (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৫১১)

জগত দেখেছে, পনেরো-কুড়ি দিনের মধ্যেই আল্লাহ্ তা'লা তাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং চরম লাঞ্ছনার সাথে ধ্বংস করেছেন। ধ্বংসের পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে কী ব্যবহার করেছেন সেটি এক পৃথক বৃত্তান্ত। যাহোক, তার ধ্বংসের নিদর্শনকে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবগত হয়ে তিনি 'ফাতহে আযীম' অর্থাৎ মহা বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। আর আজ আমরা যে এই শহরে মসজিদের উদ্বোধন করছি তা তারই পরবর্তী পদক্ষেপ বা মাইলফলক। তাঁর ইলহামের একাংশ আমরা প্রায় একশ' পনেরো বছর পূর্বে পূর্ণ হতে দেখেছি, আর এর পরবর্তী ধাপ আমরা আজ পূর্ণ হতে দেখছি। একশ' পনেরো-কুড়ি বছর পূর্বে তৎকালীন জাগতিক পত্র-পত্রিকা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চ্যালেঞ্জকে তাদের নিজ নিজ পত্রিকায় স্থান দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তার (ডুই-এর) ধ্বংসের সংবাদও ছেপেছে। অতএব, এটি খোদা তা'লার নিদর্শন ছিল যা জগৎ স্বীকার করেছে। একটি পত্রিকার কিছু অংশ আমি এখানে উল্লেখ করছি, বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই। ২৩ জুন ১৯০৭ এর 'দি সানডে হেরাল্ড বোস্টন' পত্রিকা হযরত মসীহ্ মওউদ(আ.)-এর পরিচিতি লেখার পর তাঁর দাবী ও চ্যালেঞ্জটি ছেপেছে। এরপর ডুই সম্পর্কে লিখেছে;উক্ত পত্রিকা যে শিরোনাম বানিয়েছে তা হলো-

'মির্যা গোলাম আহমদই শ্রেষ্ঠ যিনি মসীহ্ (হওয়ার দাবি করেছেন), যিনি ডুই-এর দৃষ্টান্তমূলক পরিণতির (আগাম) সংবাদ দিয়েছেন; বর্তমানে (তিনি) প্লেগ, বন্যা এবং ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী করছেন।' এটি (পত্রিকা) লিখেছে,'আগস্ট মাসের ২৩ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরভারতবর্ষের কাদিয়ানের মির্যা গোলাম আহমদ দ্বিতীয় এলিয়া হওয়ার দাবীদার আলেকজান্ডার ডুই-এর মৃত্যুর আগাম সংবাদ দিয়েছেন যা গত মার্চে পূর্ণতা লাভ করেছে।'এরপর লিখেছে, 'এই ভারতীয় ব্যক্তি পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলে অনেক বছর যাবৎ খ্যাতির শীর্ষে। তাঁর দাবি হলো, আখেরী জামানায় যে সত্য মসীহ্র আসার কথা ছিল তিনিই সেই মসীহ্ এবং খোদা তা'লা তাঁকে সম্মানে ভূষিত করেছেন। আমেরিকায় সর্বপ্রথম ১৯০৩ সালে তাঁর কথা সামনে আসে যখন তৃতীয় এলিয়ার সাথে তাঁর দ্বন্দ্বজনসমক্ষে আসে। ডুই-এর মৃত্যুর পর এই ভারতীয় নবী সুখ্যাতির তুঙ্গে, কেননা তিনি ডুই-এর মৃত্যুর ব্যাপারে বলেছিলেন যে, তাঁর (অর্থাৎ মির্যা সাহেবের) জীবদ্দশাতেই চরম দুঃখ-কষ্টের মাঝে ডুই-এর মৃত্যু হবে।' হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে পত্রিকা আরো লিখেছে, 'মিস্টার ডুই যদি আমার মুবাহালার দাবি গ্রহণ করে এবং প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতে আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়,

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)

তাহলে আমার চোখের সামনে সে চরম লাঞ্ছনা ও দুঃখ নিয়ে এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবে।'

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে লিখেছে, 'মিস্টার ডুই যদি এই মোকাবিলা থেকে পলায়ন করে তাহলে দেখ! আজ আমি আমেরিকা এবং ইউরোপের সকল অধিবাসীকে একথার সাক্ষী করছি যে, তার এমন আচরণও পরাজয় গণ্য হবে। আর এমতাবস্থায় সাধারণ জনগণের এটি বিশ্বাস করা উচিত যে, তার ইলিয়াস হওয়ার দাবি নিছক ধোঁকা ও প্রতারণা ছিল। সে যদিও এভাবে মৃত্যু থেকে পলায়ন করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে এমন অসাধারণ মোকাবিলা থেকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াও এক প্রকার মৃত্যু বৈকি! অতএব, নিশ্চিত জেনো! তার 'সেহ্ইয়োন' (যায়ন) শহরে অচিরেই এক বিপদ আসতে যাচ্ছে, কেননা এই উভয় পরিণতির যে কোনো একটি তাকে অবশ্যই গ্রাস করবে। এখন আমি এই দোয়ার মাধ্যমে বিষয়টির ইতি টানছি- হে সর্বশক্তিমান ও কামেল খোদা! যিনি সর্বদা নবীদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন এবং করতে থাকবেন, দ্রুত এই মীমাংসা প্রদান কর অর্থাৎ পিগট এবং ডুই-এর মিথ্যা জনসমক্ষে প্রকাশ করে দাও, কেননা এ যুগে তোমার অধম বান্দারা নিজেদের মতই মানুষের উপাসনায় লিপ্ত হয়ে তোমার সত্তা থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়েছে।'

এরপর পত্রিকাটি লিখেছে, 'প্রথম দিকে সুদূর প্রাচ্য থেকে প্রদত্ত এই চ্যালেঞ্জের প্রতি কেউ কোনোরূপ কর্ণপাত করেনি, কিন্তু ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৩ সালে সে তার যায়ন সিটি পাবলিকেশন-এ বলে, 'মানুষ আমাকে কখনো কখনো বলে, তুমি এধরনের কথার জবাব দাও না কেন?' সে বলে, 'তোমরা কি মনে করো আমার এসব মশা-মাছির কথারও উত্তর দেওয়া উচিত? আমি আমার পা যদি এদের ওপর রাখি তাহলে নিমিষে তাদের পিষে ফেলতে পারি। আমি আসলে তাদেরকে সুযোগ দিই যাতে তারা উড়ে যেতে পারে এবং জীবিত থাকে।' কেবল একবার সে কোনোভাবে বলেছিল যে, আমি মির্যা গোলাম আহমদকে জানি। সে মির্যা সাহেবকে নির্বোধ মুহাম্মদী মসীহ্ নামে উল্লেখ করেছে,[নাউযুবিল্লাহ্]। আর ১২ ডিসেম্বর ১৯০৩ সালে লিখে, 'আমি যদি খোদার নবী না হয়ে থাকি তাহলে খোদার জমিনে আর কেউ নেই।' এরপর সে পরবতী জানুয়ারি মাসে লিখে, 'আমার কাজ হলো মানুষকে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ এর বেড়াজাল থেকে বের করে তাদেরকে এ শহর এবং অন্যান্য সে হইয়োনী শহরে আবাদ করা যতক্ষণ না মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। আল্লাহ্ আমাদের সে দিন দেখান।' ডুই এটি লিখেছিল। 'এর বিপরীতে মির্যা সাহেব কঠোরভাবে তাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন ।

পত্রিকাটি আরো লিখেছে, 'আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া কর- আমাদের মাঝে যে মিথ্যাবাদী সে যেন প্রথমে ধ্বংস হয়ে যায়।' ডুই এমন অবস্থায় মারা যায় যখন তার বন্ধুরা তাকে পরিত্যাগ করা আরম্ভ করে এবং সে ভাগ্যবিড়ম্বনার শিকার হয়। সে পক্ষাঘাত এবং উম্মাদনার ন্যায় রোগে নিপতিত হয় এবং সে ভয়ানক মৃত্যুর শিকার হয়।

একই সাথে সে হইয়োন শহর অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। মির্যা সাহেব সম্মুখে অগ্রসর হন এবং তিনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যে, তিনি উক্ত চ্যালেঞ্জ বা ভবিষ্যদ্বাণীতে বিজয়ী হয়েছেন এবং তিনি প্রত্যেক সত্য-সন্ধানীকে সত্য গ্রহণ করার আহ্বান জানান; যেমনটি তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, তদ্বারা তিনি সেই বিপর্যয়কে যা তাঁর আমেরিকান বিরোধীর ওপর আপতিত হয়েছে, ঐশী প্রতিশোধের পাশাপাশি ঐশী ন্যায়বিচারের দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন। তাঁর এক (আহমদী) অনুসারী বর্ণনা করেন যে, 'শত্রুর মৃত্যুতে আনন্দ করা উচিত নয় যে আমরা ডুই-এর জীবনের কতক বিশেষ অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করব; এমন বিষয় আমাদের আমাদের কল্পনাতীত। আমরা এই বাস্তব সত্যকে নিজেদের উদ্দেশ্যে প্রকাশার্থে, অধিকন্তু সত্য প্রকাশার্থে বর্ণনা করি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পবিত্র ধর্ম ইসলাম মৃতদের দোষত্রুটি বর্ণনা করার শিক্ষা দেয় না। কিন্তু এর অর্থ এ-ও না যে, যেখানে সমাজ, মানবতা, সত্যতা আর খোদার (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে প্রকৃত সত্যপ্রকাশ করা উচিত সেখানে তা গোপন করা হবে।' এটি আহমদীর বরাতে আরো লেখে যে, 'ডুই-এর ওপর বিপদ আপতিত করে আর অবশেষে তার অকাল মৃত্যুজনিত দুঃখ এবং শাস্তি অবতীর্ণ করে খোদা তা'লা নিজের সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিয়েছেন, যেমনটি তিনি তাঁর রসূলকে এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার তিন-চার বছর পূর্বে জানিয়ে দিয়েছিলেন।'

(SUNDAY HERALD-BOSTON JUNE 23, 1907-MAGAZINE SECTION)

এটি একটি পত্রিকার উদ্ধৃতি যা তারা প্রকাশ করেছে। নিঃসন্দেহে এটি বিজয়ই ছিল এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ ছিল, এবং আজও তা তাঁর সত্যতার প্রমাণ; কিন্তু আমি যেভাবে পূর্বে বলেছি, তাঁর মিশন তো অনেক মহান। এটি কেবল একটি রণক্ষেত্রে বিজয়ের বৃত্তান্ত।

আমাদের সত্যিকারের আনন্দ তখন লাভ হবে, যখন আমরা জগদ্বাসীকে মহানবী (সা.)-এর চরণে সমবেত করতে সক্ষম হব। এরজন্য আমাদেরকে এই মসজিদ নির্মাণের পাশাপাশি তবলীগের নতুন নতুন পথ অন্বেষণ করতে হবে।

মুহাম্মদী মসীহ্র দলিল- প্রমাণাদি জগতের সম্মুখে উপস্থাপন করতে হবে। নিজেদের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থাকে পূর্বের চেয়ে উন্নত করতে হবে। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, প্রকৃত মহান বিজয় ছিল মক্কা-বিজয়। মক্কা-বিজয়ের পর মহানবী (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন অথবা পরবর্তী মুসলমানেরা কি তবলীগের কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন? তারা কি ইসলামের বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন নি? যুদ্ধের মাধ্যমে দেশের পর দেশ জয় করেন নি? হ্যাঁ, যুদ্ধও হয়েছে, কিন্তু তা ধর্মের প্রসারের উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং তারা হৃদয় জয় করেছিলেন, ফলে কুরবানীকারী লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। অতএব হযরত মসীহ্মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে অবিরত তবলীগ ও দোয়ার মাধ্যমে স্থায়ীরূপ দেওয়া করা অবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারীরা ঐ আখারীনদের অন্তর্ভুক্ত যারা পূর্ববতীদের সাথে মিলিত হয়েছেন। প্রশ্ন হলো, পূর্ববতীরা কি তবলীগ বন্ধ করে দিয়েছিলেন? নিজেদের আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা কি ছেড়ে দিয়েছিলেন? ইবাদতের মান কমিয়ে দিয়েছিলেন? যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে এ বিষয়গুলো বিদ্যমান ছিল, ততদিন ইসলাম উন্নতি করেছে। মুসলমানদের অধঃপতন তখন আরম্ভ হয় যখন জাগতিকতা প্রাধান্য পায় এবং তাকওয়ার মান হারিয়ে যাওয়া আরম্ভ হয়, ইবাদতের দিকে মনোযোগ কমে যেতে থাকে। কিন্তুযেহেতু মহানবী (সা.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার এ প্রতিশ্রুতি ছিল যে, কেয়ামত পর্যন্ত এই ধর্মকে তিনি প্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং সুদৃঢ় করবেন, তাই শেষ যুগে মসীহ্মওউদ এবং প্রতিশ্রুত মাহদীকে প্রেরণ করবেন। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন এবং তিনি জগতকে তাঁর প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন, আর উপকরণ না থাকা সত্ত্বেও ইউরোপ ও আমেরিকা এবং পৃথিবীর বহু দেশে তাঁর বাণী পৌঁছেছে। ডুই-এর বরাতে আমরা দেখতেই পাচ্ছি, কত মহিমার সাথে তা পৌঁছেছে।আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (আ.) মাধ্যমে ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্বাসনের যে বীজ বপন করেছিলেন তা অত্যন্ত মহিমার সাথে জগতে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে চলেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর প্রতি ইলহাম অবতীর্ণ করে বলেছেন,'খোদা এমন নন যে তোমাকে পরিত্যাগ করবেন। খোদা তোমাকে অশেষ সম্মান দেবেন। লোকেরা তোমাকে রক্ষা করবে না, কিন্তু আমি তোমাকে রক্ষা করব।'

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪২)

এধরনের অগণিত প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে প্রদান করেছেন, আর জামা'তের একশ' তেত্রিশ বছরের ইতিহাস এ বিষয়ের সাক্ষী যে, কত অসাধারণভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করে চলেছেন। আজ জামা'ত যে পৃথিবীর ২২০টি দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে- তা আল্লাহ্ তা'লারই কাজ। তিনি এ বার্তা পৌঁছানোর উপকরণাদির ব্যবস্থা করেছেন। পৃথিবী আজ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী হিসেবে চিনে। তিনি (আ.)তাঁর সকল বিরোধীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহবান জানিয়েছেন এবং পলায়ন করা ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর ছিল না,অথবা আল্লাহ্ তা'লা তাদের নির্মূল ও ধ্বংস করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, নবীদের জামা'তের বিরোধিতা চলমান থাকে, কিন্তু শত্রুদের মনোবাসনা পূর্ণ হয় না।

আহমদীয়া জামা'তের সাথে এটিই হয়ে আসছে। সকল উপায়-উপকরণ ও শক্তি তারা প্রয়োগ করেছে। হেন শক্তি নেই যা শত্রুপক্ষ জামা'তকে নিঃশেষ করার জন্য প্রয়োগ করে নি, আর আজও তা প্রয়োগ করে চলেছে। দুর্বল ঈমানের অধিকারীরা এতে হোঁচটও খায়, কিন্তু একজন চলে গেলে আল্লাহ্ তা'লা আরো হাজার হাজার লোক প্রদান করেন।

সুতরাং আমরা যদি নিষ্ঠার দাবি করে থাকি, আমরা যদি এ ঘোষণা দিয়ে থাকি যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সেই মসীহ্ মওউদ ও মাহদী, যার আগমন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করেছিলেন- সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আমাদের সমস্ত যোগ্যতা ও সামর্থকে নিয়োজিত করে এই মসীহ্ ও মাহদীর সাহায্যকারী হতে হবে। সেই আদর্শ প্রদর্শন করতে হবে যা সাহাবীরা প্রদর্শন করেছেন।

আমাদেরকে মুসলমানদেরকেও এক ও অভিন্ন ধর্মে একত্রিত করে তাদের মাঝ থেকে সমস্ত বিদাত দূরীভূত করতে হবে, আর অমুসলিমদেরকেও ইসলামের অনিন্দ্য-সুন্দর শিক্ষার সাথে পরিচিত করে তাদের এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদতকারী এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 27 Oct-3 Nov, 2022 Issue No. 43-44

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

দরূদ প্রেরণকারী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তখনই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের প্রতি সুবিচার করতে পারব, নতুবা আমাদের বয়আতের দাবী অসার। এটি অর্জন করার জন্য আমাদের ইবাদতের মানকে উঁচু করতে হবে, নতুবা মসজিদ নির্মাণ করা অনর্থক হবে। আর এটি তখনই সম্ভব যখন আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করতে সমর্থ হব। জীবনের উদ্দেশ্য কী? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'মানুষ তার জীবনের উদ্দেশ্য নিজে নির্ধারণ করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লাই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ 'আমি জ্বীন ও মানুষকে শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।' (সূরা যারিয়াত, আয়াত:৫৭)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অসংখ্য স্থানে এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। এক স্থানে তিনি এভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেন:

'মানুষকে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সে যেন তার প্রভুকে চিনে ও তাঁর আনুগত্য করে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ'আমি জ্বীন ও মানুষকে এজন্য সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমার ইবাদত করে।' কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অধিকাংশ লোক যারা পৃথিবীতে আগমন করে, প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পর নিজ আবশ্যকীয় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও জীবনের উদ্দেশ্যাবলীকে দৃষ্টিতে রাখার পরিবর্তে খোদাকে পরিত্যাগ করে জগতের দিকে ঝুঁকে যায়।এ জগতের সম্পদ ও সম্মানের মোহে এতটাই আসক্ত হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ তা'লার অংশ স্বল্পই থেকে যায় ও অনেকের হৃদয়ে তো তা থাকেই না। তারা বস্তুবাদিতার মাঝে হারিয়ে যায়। তাদের মনেই থাকে না যে, আল্লাহ্ বলেও কোনো সত্তা আছেন। হ্যাঁ, তখন মনে পড়ে যখন রূহ কবজকারী এসে প্রাণ হরণ করে,' [অর্থাৎ যখন মৃত্যুক্ষণ এসে যায়।] "

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৭৭-১৭৮)

আমরা যারা যুগের ইমামকে মান্য করার দাবী করে থাকি, আমাদের তো এভাবে জীবন অতিবাহিত করা সাজে না।আমাদেরকে তো এই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝে ইবাদতের দাবি পূরণ করতে হবে। এই সুন্দর মসজিদের প্রতি মানুষের মনোযোগ তখনই আকৃষ্ট হবে এবং তখনই আমরা ইসলামের বার্তা সত্যিকার অর্থে মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারব আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশন পূর্ণ করতে পারব, যখন আমরা আল্লাহ্তা'লার সাহায্যে নিজেদের অভিষ্ট অর্জনের চেষ্টা করব। এটি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ না আমরা আমাদের ইবাদতের দাবি পূর্ণ করি। অতএব প্রত্যেক আহমদী এবিষয়ে চিন্তা করুন এবং একে জীবনের অংশ বানানোর চেষ্টা করুন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্ব পালন করতে হবে, যেন তাঁর কৃপাভাজন হয়ে নিজেদের ইহকাল ও পরকাল সুনিশ্চিত করতে পারেন।

অতএব আজকে এই মসজিদের উদ্বোধন তখন মহান (সাব্যস্ত) হবে যদি আমরা এই প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে সক্ষম হই যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী? অন্যথায় পৃথিবীতে তো অনেক সুন্দর সুন্দর এবং খুবই উন্নত মানের মসজিদ রয়েছে, কিন্তু সেখানে যারা আসে তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করে না। কেবল একেই ইবাদত বলে না যে, দ্রুততার সাথে পাঁচবেলার নামায অথবা কয়েক বেলার নামায মুরগির ঠোকর দেওয়ার মত করে পড়ে নিবেন, বরং প্রকৃত ইবাদত হলো নামাযের যে দাবি রয়েছে তা পূর্ণ করা, একে সুন্দর করে (ধীরে-সুস্থে) পড়া। মহানবী (সা.) এক ব্যক্তিকে তিন-চারবার বা বারংবার নামায পড়তে বলার কারণ হলো, তাঁর দৃষ্টিতে সে নামাযের দাবি পূর্ণ করছিল না এবং যেভাবে ধীরে সুস্থে সুন্দর করে নামায পড়া উচিত সেভাবে পড়ছিল না।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল আযান, হাদীস-৭৫৭)

অতএব যদি নামাযগুলোর দাবি পূর্ণ করে পড়া হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যও লাভ হয়। এভাবে ইবাদতসমূহও তখন গ্রহণযোগ্যতার মানে উপনীত হয়, যখন আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের অধিকার প্রদান করা হয়। যারা মানুষের অধিকার হরণ করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, তাদের নামাযগুলো তাদের জন্য ধ্বংসের উপকরণ হয়ে থাকে আর সেগুলোকে তাদের মুখে ছুঁড়ে মারা হবে। অতএব আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মসজিদগুলোকে আবাদ করা (বা নামাযী দিয়ে ভরে তোলা) এবং আল্লাহ্ তা'লার বিধি-নিষেধ পালন করার মাধ্যমে আবাদ করা, আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা, আর (এমনটিই) হওয়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন সে কী চাইতো? সে ধর্মের নামে পৃথিবীর বুকে নিজের রাজত্ব দেখতে চাইতো। এজন্য সে হযরত ঈসা (আ.)-এর নাম ব্যবহার করেছিল। সে বড় বড় দাবি করেছিল যে, মুহাম্মদী মসীহ্র সাথে সে হেন করবে-তেন করবে; যেমনটি আমি একটি পত্রিকার বরাতে উল্লেখ করেছি। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে যখন দোয়ার চ্যালেঞ্জ দেন তখন তার পরিণাম প্রকাশ পেয়ে যায়। জগদ্বাসী সবদিক থেকে ডুই-এর অপমান ও লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করেছে। এত সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে যে, পত্র-পত্রিকাও স্বীকার করে নেয়। কেননা এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে তারা মহান আখ্যায়িত করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এই মহান বিজয়ের আনন্দে একটি স্মারক মসজিদ নির্মাণ করেই কি আমরা খুশি হয়ে যাব? যেভাবে আমি বলেছি, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার ফল খেয়েছি আর এখনো খাচ্ছি। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর মান্যকারীদেরও সেসব পদাঙ্ক অনুসরণ করার জোরালো নির্দেশ প্রদান করেছেন যা আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ার পথ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শুধু ধ্বংস করার জন্যই চ্যালেঞ্জ দেন নি, বরং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দিয়েছিলেন, জগদ্বাসীকে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করার জন্য দিয়েছিলেন। চ্যালেঞ্জ দেওয়ার কারণ ছিল, পৃথিবীতে এখন মুহাম্মদী মসীহ্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হবে, যিনি হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা উড্ডীন করে পৃথিবীতে এক-অদ্বিতীয় খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন।

অতএব আজ আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি করি- এটি তাদের দায়িত্ব। এছাড়া মুহাম্মদী মসীহ্র বার্তা দেশের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়াও আমাদের কাজ। তাদের নিকট খোদা তা'লার একত্ববাদ প্রমাণ করাও আমাদের দায়িত্ব। আর এ কাজ তখন হবেযখন আমরাও খোদার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলব এবং তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'আমার জামা'তের (সদস্যদের) জন্য বিশেষভাবে তাকওয়া অর্জনকরা আবশ্যক। কেননা তারা এমন একজন ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ যিনি প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবিকরেছেন; যেন সেসব লোক যারা কোন ধরনের হিংসা, বিদ্বেষ বা অংশীবাদিতায় লিপ্ত অথবা তারা যত জগৎমুখীই থাকুক না কেন, (তারা) যেন সেই সমস্ত বিপদাপদ থেকে মুক্তি পায়।' (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১০)

অতএব নিজেদের আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতাও একান্ত আবশ্যক, আর যখন এই আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হবে তখন তাকওয়া সৃষ্টি হবে। এর ফলে জগদ্বাসী নিদর্শনের পর নিদর্শন প্রকাশিত হতে দেখবে। আর এটিই সেই মর্যাদা যে পর্যায়ে বিজয়ের নতুন নতুন পথ খুলতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। আর এটিই হলো সেই ফাতহে আযীম বা মহান বিজয়ের প্রকৃত তাৎপর্য যা আমরা প্রত্যক্ষ করব।

অতএব হে মুহাম্মদী মসীহ্র দাসেরা! প্রত্যেক বিজয়ের নিদর্শন আমাদের মাঝে একটি বিপ্লব সাধনকারী হওয়া উচিত। সুতরাং আপনারা এই অঙ্গীকার করুন যে, আজকের দিনটি আমাদের মাঝে এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধনের দিন হবে।

(আর একইসাথে) আমাদের সন্তানসন্ততি ও আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধনের দিন হবে এবং (তা-ই) হওয়া উচিত। অন্যথায় ডুইয়ের মৃত্যুতে বা এই শহরের বাসিন্দারা ডুইয়ের নাম না জানলে আমাদের কী লাভ হতে পারে যে, 'আমরা তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, অথচ তারা তাকে চিনতো না।'এটি তখনই লাভজনক হতে পারে যদি এই মহান বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার মাধ্যমে আমাদের মাঝেও একটি মহান বিপ্লব সাধিত হয়, আর আমাদের দেশবাসী এবং জগদ্বাসীও হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দাসত্বের জোয়াল নিজেদের ঘাড়ে তুলে নেয় আর খোদা তা'লার একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে যায় এবং এর জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে এই পদমর্যাদা অর্জনের সৌভাগ্য দান করুন।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir